পশ্চিমবঙ্গ বাজেট 2020

বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

পশ্চিমবঙ্গ বাজেট ২০২০ : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

সূচিপত্র

- রাজনৈতিক বা অর্থনীতির নয়, তোষণের বাজেট...
  ড. পঙ্কজকুমার রায় পৃষ্ঠা: ১
- পশ্চিমবঙ্গের বাজেট: বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যানের হাতবাক্স...
  দেবযানী ভট্টাচার্য পৃষ্ঠা: ২
- মানুষের নয়, চমকের বাজেট...
  অভিরূপ ঘোষ পৃষ্ঠা: ৫
- বেহাল বাজেট...
  সৌরভ ঘোষ পৃষ্ঠা: ৭
- বাজেট ২০২০: কিছু অসত্য ও অর্ধসত্যের বিবরণী...
  সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠা: ৮
- একটি প্রতিশ্রুতিমুখর বাজেট ও রাজ্যের দিশাহীন অর্থনীতি...
  প্রণব মসন্ত পৃষ্ঠা: ১১
- উপসংহার: ঋণের ফাঁদে পশ্চিমবঙ্গ পৃষ্ঠা: ১৩

রাজনৈতিক বা অর্থনীতির নয়, তোষণের বাজেট

ড. পঙ্কজকুমার রায়

সরকার চলছে। সাড়ে আট বছরে রাজ্যের ঋণ ১,৯৩,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৩১,৯২৮ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার বাজার থেকে ৪৮,৭৩৪ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করবে। বকরূপী ধর্মযুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পৃথিবীতে সুখী কে? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, স্বদেশে দিনান্তে ঋণমুক্তভাবে শাক-অন্ন যিনি গ্রহণ করেন, তিনি সুখী। মা-মাটি-মানুষের সরকার রাজ্যকে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত'-এর অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবর্ষের জন্য ২,৫৫,৬৭৭ কোটি টাকার বাজেটে ৮ কোটি টাকার ঘাটতি, অসীম দাশগুপ্তের শূন্য বাজেটের ধারণার সম্প্রসারণ মনে হয়। যার মধ্যে রাজ্যের কর থেকে অর্থ সংস্থান হবে ৭০,৮০৭ কোটি টাকা, বাকি অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আয়কর ও কর্পোরেট করের জন্য ৭০ হাজার কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় অনুদান ৩৫,০০০ কোটি টাকা। ২০২০-২১ প্রচুর পরিমাণ জিএসটি আদায়ের প্রস্তাব রেখেছেন, যে আয়ের বড় অংশ নতুন প্রকল্পে ব্যয় হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বাজেটের আয়-ব্যয়ের সমতা আনবে মদ ও লটারি থেকে আয়।

এই বাজেটে রাজ্যে ৯.১১ লক্ষ কর্মসংস্থানের অলীক কল্পনা সামনে আনা হয়েছে। কৃষিতে ৫,৮৬০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ, শিল্প-বাণিজ্যে ১,১৫৮ কোটি টাকা, রাস্তা ও পরিকাঠামোতে ৪,৪০০ কোটি টাকা, স্কুলশিক্ষায় ৮,৭৫০ কোটি টাকা, উচ্চ শিক্ষায় ৭০০ কোটি টাকা, কারিগরি শিক্ষায় ৯০০ কোটি টাকা, স্বাস্থ্যে ১১,১০২ কোটি টাকা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নে ২০,৭৮৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

যে নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তা হল— প্রবীণ এসসি নাগরিকদের জন্য 'বন্ধু' প্রকল্পে ২০০ কোটি টাকা, আদিবাসী প্রবীণদের জন্য 'জয় জহর' প্রকল্পে ৫০০ কোটি টাকা, তরুণ-তরুণীদের সহজ শর্তে ঋণ নিতে 'কর্মসাথী' প্রকল্পে ৫০০ কোটি, ৩৭০টি চা বাগানের জন্য 'চা সুন্দরী' প্রকল্পে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দর কথা বলা হয়েছে।

তিনশো মাদ্রাসায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার জন্য ৬০০ স্মার্ট ক্লাসঘর, যা বিগত বছরের ৩০০ স্মার্ট ক্লাসঘর ব্যতিরেকে বানানো হবে। এখানে প্রশ্ন, তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মাদ্রাসা শিক্ষাকে এতটা প্রাধান্য দিয়ে আমরা কি দেশের ছাত্র-যুবদের মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছি না!

এই সরকারের বিশেষ অভিমুখ সংখ্যালঘু তোষণ ও পোষণে। সংখ্যালঘু, মাদ্রাসা শিক্ষায় ৩,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ। আট বছরে ২.০৩ কোটি সংখ্যালঘু ছাত্রদের বৃত্তি দিতে ৫,৬৫৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তৃতীয় হজ হাউস তৈরি করতে পূর্ববর্তী বাজেটে ৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু বীরসামুণ্ডা, আম্বেদকর এবং ওবিসি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরিতে নামমাত্র ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ ছিল ২৯৮ কোটি টাকা। পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৪,১৫১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে দাঁড়িয়েছে ৪,৬০৮ কোটি টাকা। অমিত মিত্র মুনাফাঘাত ও মূলধনী খাতের বরাদ্দ মিশিয়ে দিয়ে গুলিয়ে দেওয়া অর্থনীতি উপহার দিতে চাইছেন।

বাজেটে বেশি সময় ব্যয় হয়েছে দেশের অর্থনীতি, কেন্দ্রীয় বাজেট, সিএএ, যা রাজ্য বিধানসভায় আলোচ্য বিষয় নয়। ইউজেন বেয়ার বলেছিলেন, 'ভালো অর্থনীতি হল খারাপ রাজনীতি আর খারাপ অর্থনীতি হল ভালো রাজনীতি।' অমিত মিত্র দ্বিতীয়টির অভিমুখে ধ্বনিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির 'ও আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'

ভুলে সাহিত্যে অণবদ্য অভদানের জন্য ডিলিট প্রাপ্তার 'কবিতাঞ্জলী' আবৃত্তি করে বলেন—

'এই মাটিতেই গড়ব মোরা উন্নয়নের ঘাঁটি,
আমাদের এই বাংলা হোক সপনার চেয়ে খাঁটি।'

পরিশেষে শুধু বলব, আজ তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তরী।

তিনশো মাদ্রাসায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার জন্য ৬০০ স্মার্ট ক্লাসঘর, যা বিগত বছরের ৩০০ স্মার্ট ক্লাসঘর ব্যতিরেকে বানানো হবে। এখানে প্রশ্ন, তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মাদ্রাসা শিক্ষাকে এতটা প্রাধান্য দিয়ে আমরা কি দেশের ছাত্র-যুবদের মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছি না!

বাজেটে বেশি সময় ব্যয় হয়েছে দেশের অর্থনীতি, কেন্দ্রীয় বাজেট, সিএএ, যা রাজ্য বিধানসভায় আলোচ্য বিষয় নয়। ইউজেন বেয়ার বলেছিলেন, 'ভালো অর্থনীতি হল খারাপ রাজনীতি আর খারাপ অর্থনীতি হল ভালো রাজনীতি।'

লেখক: অধ্যক্ষ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ

সৌজন্য: দৈনিক সংবাদপত্র 'একদিন'

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট: বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যানের হাতবাক্স

দেবযানী ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট বাজেট কম রাজনৈতিক বক্তৃতা বেশি। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রডাক্টের বৃদ্ধির যে হার ঘোষণা করে থাকেন, কেন্দ্রের Central Statistics Office এর ডেটায় পশ্চিমবঙ্গের GSDP গত সাত আট বছর ধরেই তা থেকে গড়ে প্রায় ২ শতাংশ কম থাকে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের GSDPর বৃদ্ধির হার আদতে তত নয়, যতটা রাজ্য প্রজেক্ট করে। CSOর ডেটার সঙ্গে রাজ্যের ডেটার এই অমিল রাজ্যের মানুষের জন্য বেশ অস্বস্তিকর। (নীচের টেবিল)

	GSDPS (Constant) Growth % WB Budget	GSDP (Constant) Growth % -- CSO
২০১২-১৩	৫.৬	৪.২
২০১৩-১৪	৬.৫	৩.০
২০১৪-১৫	৯.০	২.৮
২০১৫-১৬	৫.৯	৬.১
২০১৬-১৭	৮.০	৭.০
২০১৭-১৮	১১.৫	৯.১

উপরন্তু রাজ্যের অর্থমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের ব(ঙ্গঞ্জর বৃদ্ধির হারকে প্রতি বছর তুলনা করেন ভারতের GDP'র বৃদ্ধির হারের সঙ্গে। এই তুলনা অনুচিত। ২০১৯-২০ তে পশ্চিমবঙ্গের প্রজেক্টেড্ GSDP ১৩,১৪,৫২৯ কোটি আর এই পিরিয়ডে ভারতের প্রজেক্টেড্ GDP 149.79 লক্ষ কোটি। পশ্চিমবঙ্গের GSDP যেখানে গোটা দেশের GDPর সাড়ে এগারো ভাগের একভাগ মাত্র, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের GSDPর বৃদ্ধির হার যদি গোটা দেশের GDPর বৃদ্ধির হারের দ্বিগুণও হয়, তবে সেই হারকে খুব তাৎপর্যপূর্ণরকমভাবে বেশি বলা যায় কি? উপরন্তু ডেটা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের GSDP'র বৃদ্ধির হার রাজ্যের প্রজেক্টেড হারের চেয়ে বাস্তবে কম।

অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ভারতের অর্থনীতির সমালোচনা করেছেন stagflation বলে। বলেছেন বর্তমানে ভারতের অর্থনীতির বৃদ্ধিও মন্থর হয়েছে, আবার মুদ্রাস্ফীতির সমস্যাও রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী যা বলেন নি, তা হল ২০১৮ সালে মুদ্রাস্ফীতির হারে পশ্চিমবঙ্গ সব রাজ্যকে টেক্কা দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির হার হয়েছিল দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ;৭.৩৭%, যেখানে ২০১৪-১৯ এ গোটা দেশের গড় মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৪.৫%. অর্থাৎ ইনফ্লেশন পশ্চিমবঙ্গে কম নয়। বরং জাতীয় গড়ের চাইতে বেশি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ গর্ব করে বলে যে ১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে এক নম্বরে। এই তথ্য কতখানি গর্বের আর কতখানি লজ্জার সে প্রশ্ন অতি প্রাসঙ্গিক। এই তথ্যের প্রকৃত অর্থ হল, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন মানবসম্পদের এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশ মূলতঃ কর্মহীন। সেই কারণেই ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি আইনের আওতায় ১০০ দিনের কাজে তাদের যোগদান অধিক।

MNREGA প্রকল্পের উপভোক্তাদের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জনধন অ্যাকাউন্টে ডায়রেক্ট বেনেফিট ট্রান্সফার বা DBT করতে চাইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার MNREGA উপভোক্তাদের নাম ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য কেন্দ্রকে পাঠাতে রাজী হয় নি। MNREGA'র অনুদান কেন্দ্রের থেকে এলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা বন্টনের ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখেছে এবং সেখান থেকে উঠেছে দুর্নীতি ও তছরূপের প্রশ্নও।

MNREGA প্রকল্পের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান সমালোচনাটি হল, এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে। পশ্চিমবঙ্গ MNREGA'য় দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে। তার ফলেই সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির হারও জাতীয় গড় মুদ্রাস্ফীতির হারের তুলনায় বেশি।

মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে দৈনন্দিন বাজারে। কাঁচাবাজারে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ মুদ্রাস্ফীতি, পশ্চিমবঙ্গে যা বেশি। অর্থাৎ জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির পিছনে রাজ্য সরকারেরও হাত আছে।

অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ভারতের IIP বা ইনডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাকশনের তুলনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবৃদ্ধির হারের সঙ্গে। বলেছেন April থেকে November– 2019 পিরিয়ডে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবৃদ্ধির হার উক্ত পিরিয়ডে ভারতের IIP'র ছ'গুণ। কিন্তু অঙ্কের দৃষ্টিতে দেখলে এই দুইটি তুলনীয় কিনা, তা অস্পষ্ট। কারণ যথেষ্ট ডেটার অভাবে কনস্ট্রাকশন, গ্যাস ও জলসরবরাহ ইত্যাদি শিল্প সেক্টরগুলির বৃদ্ধি ভারতের IIP হিসেব করার সময় ধরা হয় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল বৃদ্ধির হার ঠিক কিভাবে হিসেব করা হয়, হুবহু ভারতের IIP হিসেব করার নিয়মেই কি না, সে সম্বন্ধে অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। দুটি ইনডেক্সের ফরম্যাট যদি এক না হয়, তবে ভারতের ইনডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাকশনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবৃদ্ধির হারের তুলনা করা অঙ্কের নিয়মে ভুল ও বিভ্রান্তিকর। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা এমন নানা বিভ্রান্তিকর তথ্যে পরিপূর্ণ।

বিভ্রান্তির অপর একটি উদাহরণ হল, অর্থমন্ত্রী বলেছেন EoDB বা ইজ অফ ডুয়িং বিজনেসে পশ্চিমবঙ্গ নাকি ফার্স্ট। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও KPMG'র report অনুযায়ী ইজ অফ ডুয়িং বিজনেসে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দেশের মধ্যে একাদশ। এই প্রকার নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য এই বাজেট বক্তৃতার বিশেষত্ব।

অমিত মিত্র পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগ আসছে বলে গর্ব করেছেন। রাজ্যবাসী হিসেবে আমরাও গর্বিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ডেটাও দেখাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কৃতিত্ব নরেন্দ্র মোদীর ''অ্যাক্ট ইস্ট'' নীতির ওপরে মূলতঃ বর্তায় কারণ ২০১৪ য় প্রথম NDA সরকার গঠিত হওয়ার পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেছিলেন যে দেশের পূর্বাংশ যদি পশ্চিমাংশের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে অনেকখানি পিছিয়ে থাকে তবে তা গোটা দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির পথেই অন্তরায় হয়। এবং তার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ও নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলিতে বিদেশী বিনিয়োগ ক্রমেই বাড়ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য দেখলে বোঝা যায় NDA১ এর আমলে FDI বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে।

ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যাণ্ড প্রোমোশন, DPIIT'র তথ্য অনুযায়ী April ২০০০ থেকে June ২০১৯ পর্যন্ত ৯ বছরে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও আন্দামান-নিকোবরে বিদেশী পুঁজি লগ্নি হয়েছে প্রায় ৩৭,০০০.০০ কোটি টাকার। এর মধ্যে, অমিত মিত্র বলেছেন, ২২,২৬৭ কোটি টাকা লগ্নিকৃত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। অর্থবর্ষ অনুযায়ী দেখলে দেখা যাবে যে ২০১১-১৬'য় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম টার্মে পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগের তুলনায় ২০১৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে আসার পরেই বিদেশী বিনিয়োগ লাফিয়ে বেড়েছে। এর কারণ ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসার পর প্রথমে জনধন অ্যাকাউন্ট ও উজ্জ্বলা যোজনার কাজ বেশ খানিক এগিয়ে যাওয়ার পরেই মোদী তাঁর ''অ্যাক্ট ইস্ট'' নীতির জোরদার প্রয়োগ শুরু করেন। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের পর থেকে মাত্র দু'বছরে ২৫ গুণ বৃদ্ধি পায় পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজিত বার্ষিক বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট একটি বাৎসরিক পিকনিক হয়েই রয়ে গিয়েছে। তা থেকে বছরে বছরে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস ছাড়া আর প্রায় কিছুই পাওয়া যায় নি। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী সে কথা স্বীকার করবেন না।

FY	Foreign Investment in West Bengal
2016-17	332 Crores
2017-18	409 Crores
2018-19	8112 Crores

পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ শিল্পগুলির পুনর্শিল্পায়ণ বা re-industrialization আজও করে উঠতে পারে নি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তার জন্য যথেষ্ট প্রয়াসও করা হয় নি রাজ্যসরকারের দিক থেকে। ভাঙ্গরে Powergrid এর কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে অপরাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতায়। অপরাজনৈতিক শক্তিকে পরাস্ত করে সে সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেখানে পাওয়ারগ্রিডের হাই টেনসন লাইনের সার্ভে করতে এসে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের পরিচালনায় ভাঙ্গরের লোকেদের হাতে বন্দী হওয়ার মুখে পর্যন্ত পড়েছেন পাওয়ারগ্রিডের লোকেরা। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের সমস্ত উপাদান থাকলেও রাজনৈতিক পরিবেশ নেই। অমিত মিত্র বাজেট বক্তৃতায় একথা বলেন নি।

বামফ্রন্টের ৩৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণের পরিমাণ ছিল 1,93,000.00 কোটি। তৃণমূলের ৯ বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 4,74,831.00 কোটি। অর্থমন্ত্রী প্রতিবছরের বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে বিপুল ধার শোধ করেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যে কথাটি মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেন না সেটি এই যে, যতখানি ঋণের বোঝা বামফ্রন্ট আমলে চেপেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপরে, তৃণমূলের মাত্র ন'বছরের লেজিসলেশনে তা আড়াইগুণ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এই লেজিসলেশন যদি চলে তাহলে আরও পাঁচ বছরে ঋণের বোঝা যেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তাতে রাজ্যে অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা এসে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কেন্দ্রের অনুদানের টাকা পাওয়ার জন্য নানা প্রকল্পের রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়। পরিকল্পনা খাতের টাকা পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে খরচ করা চলে না বা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত নির্দেশিকা বহির্ভূতভাবে ব্যয় করা চলে না। কিন্তু সদাবিদ্রোহী পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সকল নিয়ম মেনে চলে না, ফলে অনুদানের টাকা পেতে বিলম্ব হয় বা আটকে যায়। এই বিষয়টিকেই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রের অসহযোগিতা বলে উল্লেখ করেছেন। আদতে এটি কেন্দ্রীয় অসহযোগিতা নয়, বরং রাজ্যের দিক থেকে ফিসক্যাল ইনডিসিপ্লিন। এই একই ইনডিসিপ্লিন বামফ্রন্ট আমলেও ছিল, এবং বামফ্রন্টও একে বলত "কেন্দ্রের বঞ্চনা"। "সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।"

প্রকল্প খাতে ঘাটতি মেটাতে বর্তমান রাজ্যসরকার ক্রমাগত ঋণ নিয়েছে। ফলে বেড়েই চলেছে পশ্চিমবঙ্গের ফিসক্যাল বার্ডন এবং ক্রমশঃ দুর্বল হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ফিসক্যাল হেলথ্। অথচ কেন্দ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চললে রাজ্যের কোষাগারের হাল ধীরে ধীরে ফিরতে পারত। ঋণের বোঝা এতখানি বৃদ্ধি পেত না।

ভারত সরকার প্রোমোট করতে চাইছে ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে ফিসক্যাল ডিসিপ্লিনও। ভারত তার ঋণের বোঝা কমিয়ে ফেলছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ ছিল ভারতের GDP'র ৫২.২%. ২০১৯ এ এসে সেই ঋণ দাঁড়িয়েছে ভারতের GDP'র ৪৮.৭%. ঋণের বোঝা কমানোর জন্য ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পগুলিতে টাকা খরচ করার জন্য ভারত সরকার নির্ধারিত কিছু নির্দেশিকা অনুসরণ করে চলার ওপর জোর দিচ্ছে, যাতে ব্যয়িত অর্থ নীতি আয়োগের পরিকল্পনা যথাযথভাবে রূপায়ণ করতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফিসক্যাল ইনডিসিপ্লিনের কারণে কেন্দ্রীয় অনুদানের টাকা সময় মত জোগাড় করতে না পেরে রাজ্যের ঋণের বোঝা ক্রমাগত বাড়িয়ে ফেলছে।

ভারত সরকার ভারতের অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করে তোলার ওপর জোর দিচ্ছে, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এর নীতি অবলম্বন করে রাজ্যের অর্থনীতির ভিত্তি নড়বড়ে করে ফেলেছে।

নীতি আয়োগের মিটিংগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রায়শঃই উপস্থিত থাকেন না। হয়ত রাজ্যের প্রকল্পগুলির নানা সমস্যা তিনি অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের সামনে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে চান না। ফলে রাজ্যের নানা প্রকল্পের বিষয়ে কেন্দ্রের সহযোগিতা পেতে অসুবিধা হয় আর তার কুফল ভোগ করতে হয় রাজ্যকে অর্থাৎ রাজ্যের মানুষকে। পশ্চিমবঙ্গের এই বিপুল পরিমাণ ঋণ শোধ করতে হলে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে, মেলা, খেলা উৎসবে অপরিমিত ব্যয় সংকোচ করা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিসক্যাল ইনডিসিপ্লিনের অপর একটি পরোক্ষ প্রমাণ হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এরাজ্যে CAG'র প্রসেস অডিটে বাধা দিয়েছেন। CAG'র প্রসেস অডিট হলেই তছরূপের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসে পড়বে। পরিকল্পনা খাতের টাকা যে যথেচ্ছভাবে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যয়িত হচ্ছে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। সেটিই সম্ভাব্য কারণ যে মুখ্যমন্ত্রী CAG'র প্রসেস অডিটে বাধা দিয়েছেন।

CAG'র প্রসেস অডিটে বাধা দেওয়ার অপর মুখ্য কারণ সম্ভবতঃ এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কর্মচারীদের বেতনের মহার্ঘ্য ভাতা না দিয়ে সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প চালাচ্ছে। অথচ নিয়ম অনুযায়ী কর্মচারীদের বেতন সরকারের সর্বপ্রথম উত্তরদায়িত্ব। CAG প্রসেস অডিট হলে দেখা যাবে কার্যতঃ কর্মচারীদের ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত করে রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে সেই অর্থ ব্যয় করছে। এইসব বিড়ম্বনা ও তছরূপের দায় এড়াতেই সম্ভবতঃ CAG প্রসেস অডিট আটকে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে জয়যুক্ত হয়েছেন কর্মচারীরা। কিন্তু কোর্টের রায়ে কর্ণপাত মাত্র করে নি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কর্মচারীরা সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেছেন, কিন্তু সে বিষয়েও রাজ্য সরকারের কোনো হেলদোল দেখা যায় নি।

ষষ্ঠ পে কমিশনের নামে যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে, সেটিও বাস্তবে একটি দুর্নীতি বলে সন্দেহ করার কারণ আছে। পে কমিশনের চেয়ারম্যান অভিরূপ সরকার যে রিপোর্টটি দিয়েছেন সেটি বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম পে কমিশনের রিপোর্টটিরই প্রায় হুবহু পুনরুপস্থাপনা। ফলে সঙ্গত প্রশ্ন উঠেছে যে রিপোর্ট নকল করতে শ্রী অভিরূপ সরকারের মত অর্থনীতিবিদের চার বছর লাগল কেন। অভিরূপ সরকারের বেতন বাবদ এতগুলি বছরে যে সরকারি অর্থ ব্যয়িত হয়েছে সে ব্যয়ের যৌক্তিকতা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। ষষ্ঠ পে কমিশনের রিপোর্টে চেয়ারম্যান অভিরূপ সরকার উল্লেখ করেছেন যে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দিতে রাজ্য সরকার বাধ্য নয়, রাজ্য চাইলে নিজস্ব CLI অনুযায়ী কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা দিতে পারে। বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান যদিও এই কথা বলেই দায় সেরেছেন, রাজ্যের কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতার হার কি হওয়া উচিত সেটি হিসেব করার পরিশ্রমটি করেন নি। অথচ বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে চার বছর যাবৎ কোন্ দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন সে নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যুরো অব অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স দপ্তরের কাজের অন্যতম হল রাজ্যের কনজুমার প্রাইস ইনডেক্স হিসেব করা। অতএব রাজ্য সরকারের পক্ষে নিজস্ব ইনডেক্স অনুযায়ী মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া অসম্ভব নয়। বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান সে বিষয়টি সরকারের নজরে এনেছেন কি না তা জানা যায় নি।

মহার্ঘ্য ভাতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বেসরকারি কর্মচারীরা যেখানে মহার্ঘ্য ভাতা পান না, সেখানে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হবে কেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়ত জানেন না যে নিয়োগকর্তা যেহেতু সরকার এবং জিনিসপত্রের দামের ওঠাপড়ার দায়ও যেহেতু সরকারের এবং যে বাজারে জিনিসের দাম সরকারি নীতির প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে বাড়ে সেই বাজার থেকেই জিনিসপত্র কিনতে যেহেতু সরকারি কর্মচারীরা বাধ্য, সেইজন্যই তাঁদের মাইনের ক্রয়ক্ষমতা যাতে অপরিবর্তিত থাকে সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া সরকারের ন্যায্য দায়িত্ব ও নিয়ম। মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া মানে সরকারি কর্মীদের মাইনে বাড়ানো নয়, বরং মাইনের কমে যাওয়াকে রোধ করা। বেসরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রেও বাৎসরিক অ্যাপ্রেইজালের ভিত্তিতে বেতন বৃদ্ধি হয় যদিও বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের তাৎপর্য সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে আলাদা। সরকারি চাকরিতে ইনক্রিমেন্ট হল শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার দাম। তাই তা ন্যূনতম থাকে এবং তার সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক থাকে না। অর্থাৎ নতুন চাকরিতে ঢোকা একজন অনভিজ্ঞ কর্মচারীর চেয়ে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন কর্মচারীর সেই পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার মূল্য হিসেবে পাঁচটি ইনক্রিমেন্ট পাওনা হয়। কিন্তু সেই পাঁচ বছর আগে ঢোকা একজন নতুন অনভিজ্ঞ কর্মচারী যে বেসিক পে চাকরিতে যোগ দেন, তার পাঁচ বছর পরে যদি সেরকমই নতুন অনভিজ্ঞ কেউ সেই একই চাকরিতে যোগ দিতে আসেন, তবে তাঁকেও সেই একই পাঁচ বছরের পুরোনো

বেসিক পে'তে চাকরিতে যোগ দিতে হয়। ইতিমধ্যে এই পাঁচ বছরে বাজারে মূল্যবৃদ্ধি যাই ঘটে থাকুক না কেন, চাকরিতে যোগদানের সময়ের বেসিক পে-তে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু বেসরকারি ক্ষেত্রে তা হয় না। বেসরকারি ক্ষেত্রে পাঁচ বছর আগে যে মাইনেতে একজন নতুন অনভিজ্ঞ কর্মচারীকে চাকরিতে নেওয়া হয়, পাঁচ বছর পরে সেই একই চাকরিতে একই যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে নিতে গেলে সাধারণতঃ কোম্পানীরা বেশি মাইনে অফার করতে বাধ্য হন। কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরিতে কোনো ব্যক্তি ২০০৯ সালে কোনো বিশেষ পদে যোগ দেওয়ার সময় যে প্রারম্ভিক বেসিক পে'তে যোগদান করেছিলেন, ২০১৮ সালে সেই একই পদে যোগ দিতে গেলে একই রকম যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির প্রারম্ভিক বেসিক পে একই ছিল। কিন্তু ন'বছরে বাজারমূল্য এক জায়গায় থেমে ছিল না। অথচ ২০০৯ সালের সেই প্রারম্ভিক বেসিক পে'র যা ক্রয়ক্ষমতা ছিল, ২০১৮ সালে সমান বেসিক পে র ক্রয়ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছিল। সেই ব্যবধানকে পূরণ করতে বেসরকারি কোম্পানীগুলি ২০০৯ সালে কোনো পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে গিয়ে যে প্রারম্ভিক বেতন অফার করত, ২০১৮ সালে সেই একই চাকরিতে একই যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নিয়োগ করতে গিয়ে অনেক বেশি প্রারম্ভিক বেতন অফার করতে বাধ্য হয়েছে। সরকারি চাকরিতে যেহেতু বেশি প্রারম্ভিক বেসিক পে অফার করার কোনো উপায় নেই, তাই সেই প্রারম্ভিক বেসিক পে'র বাস্তব মূল্যহ্রাস রোধ করতে এবং বাজার মূল্যের ব্যবধান পূরণ করতে যে বাড়তি টাকা ভাতা হিসেবে দেওয়া হয়, তাকেই বলা হয় মহার্ঘ্যভাতা। অর্থাৎ আদতে বেসরকারি কর্মীরাও মহার্ঘ্য ভাতা পান কিন্তু যেহেতু সেই টাকাটা প্রতি নিয়ত মূল বেতনের সঙ্গে জুড়ে যেতে থাকে আর তাকে আলাদা করে রেখে আলাদা নামে ডাকা হয় না, তাই হয়ত মুখ্যমন্ত্রীর মনে হয়েছে যে তাঁরা মহার্ঘ্যভাতা পান না। বাস্তবে বেসরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রতি নিয়ত যে ঘটনা ঘটতে থাকে অর্থাৎ মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘ্যভাতার মিশে যাওয়া, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটে দশ বারো বছর পর পর যখন বেতন কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করা হয়। তাই এ ব্যাপারে বলাই যায় যে বেতন পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মচারীরা সরকারি কর্মচারীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে এবং তাদের মধ্যে তুলনা করার চেষ্টা করা বৃথা। তাছাড়া মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার পিছনে বেসরকারি কোম্পানীর যেহেতু কোনো হাত নেই, তাই বেসরকারি নিয়োগকর্তারা মূল্যবৃদ্ধির ক্ষতিপূরণ তাঁদের কর্মচারীদের দিতে বাধ্য থাকেন না। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ বেসরকারি কোম্পানীই প্রতি বছর তাদের কর্মচারীদের বেতন পুনর্বিবেচনা করে থাকেন। আর সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগকর্তা যেহেতু সরকার নিজে, এবং মূল্যবৃদ্ধির দায়ও যেহেতু সরকারের, তাই সরকারকে মহার্ঘ্য ভাতা দিতে হয়। অর্থাৎ মহার্ঘ্য ভাতা মানে মাইনে বাড়ানো নয়, মাইনে কমে যাওয়া আটকানো।

গত চার বছরের মহার্ঘ্য ভাতা না পাওয়ায় এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের মাইনে কমে গিয়েছে। আইনতঃ যে কাজের জন্য যে মাইনে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি স্বয়ং রাজ্যপালের কাছ থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের মাধ্যমে পেয়ে তাঁরা চাকরিতে ঢুকেছিলেন, এই মুহূর্তে সেই একই কাজ করার জন্য তাঁদের বহু কম মাইনেতে কাজ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরা সঠিক মাইনে পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আইন অমান্য করছে তার কর্মচারীদের বঞ্চিত করে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের গ্রাস করেছে গভীর ক্ষোভ ও হতাশা। বহু কর্মী চাকরি ছাড়তে চাইছেন, কিন্তু সরকার ভলান্টারি রিটায়ারমেন্টের অনুমোদন দিতে চাইছে না।

২০২০র জানুয়ারী মাস থেকে বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নতুন বেতনক্রম কার্যকর হওয়ার পর দেখা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের বেতনের স্লিপে মহার্ঘ্য ভাতার কলামটিই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বেতনে মহার্ঘ্য ভাতার কোনো উল্লেখ মাত্র নেই। অথচ জিনিসপত্র মহার্ঘ্য হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে, অথচ মহার্ঘ্য ভাতা ছাড়া সরকারি কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা যে ক্রমশঃ কমে যাবে সে বিষয়ে সরকার সংবেদনশীল নয়। বেতন দেওয়ার সঙ্গতি না থাকলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত ছিল কর্মী-সংকোচনের উদ্দেশ্যে এই বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ভলান্টারি রিটায়ারমেন্টের কোনো প্রকল্প ঘোষণা করা যাতে রিটায়ারমেন্ট নিতে ইচ্ছুক কর্মীরা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে। তার পরিবর্তে তাদেরকে জোর করে কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য করে বেআইনি ও অমানবিক পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

বামফ্রন্টের সঙ্গে তৃণমূলের একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে পাওয়ার সেক্টরের সংস্কার সাধন ব্যতীত রাজ্যের উন্নয়নে বামফ্রন্ট আর প্রায় তেমন কিছুই করে নি। তেমন কোনো সামাজিক প্রকল্পেও হাত দেয় নি। কিন্তু তৃণমূল কিছু প্রকল্প রূপায়ন করেছে। বেশ কিছু পরিকাঠামো গঠনের কাজও তারা করেছে। কিন্তু সেসব করতে গিয়ে পদ্ধতিগতভাবে তারা এতটাই স্বেচ্ছাচারী ও অগণতান্ত্রিক হয়েছে যে সামাজিক উন্নয়নের নামে রাজ্যের কোষাগারের হাল বেহাল হয়ে পড়েছে। রাজ্যে আইনের শাসন ব্যক্তির শাসনে পরিণত হয়েছে। অমিত মিত্র তাঁর বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই 'দ্য ইকোনমিস্ট' পত্রিকার রেফারেন্স দিয়ে সমালোচনা করেছেন যে গ্লোবাল ডেমোক্রেসি ইনডেক্সে ভারত অন্যান্য সমস্ত দেশের মধ্যে ১০ ধাপ নেমে গিয়েছে। অর্থমন্ত্রী যা চেপে গিয়েছেন তা হল এই যে ভারতবর্ষে যদি গণতন্ত্রের অবনতি হয়ে থাকে তবে তার পিছনে ভারতের অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অবদান নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি কারণ এ রাজ্যে বিরোধী রাজনীতি করার অপরাধে মরতে হয়েছে অজস্র মানুষকে।

এ বিষয়ে আবার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গে গড় মুদ্রাস্ফীতির হার গোটা ভারতের গড় মুদ্রাস্ফীতির হারের চেয়ে বেশি। এবং মুদ্রাস্ফীতি যেহেতু সরাসরি মূল্যবৃদ্ধির কারণ হয়, ফলে পশ্চিমবঙ্গ যদি নিজস্ব Cost of living index হিসেব করতে যায়, তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতার হার কেন্দ্রীয় হারের চাইতে বেশি হবে। সেই কারণেই হয়ত রাজ্য সরকার অনৈতিক ও বেআইনিভাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বঞ্চিত করছেন। উপরন্তু অর্থনৈতিক গতিমন্থরতার সময় সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা দিয়ে দিলে সেই অর্থ রাজ্য তথা দেশের অর্থনীতিকে বেশ খানিক চাঙ্গা করতে পারত। কারণ মধ্যবিত্তের হাতে খরচযোগ্য টাকা এলে সে টাকা অর্থব্যবস্থার সমস্ত স্তরে বন্টিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিতর্কিত বা বিতর্কের উদ্রেক করার সম্ভাবনা সমৃদ্ধ বিষয়গুলিকে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় প্রত্যাশিতভাবেই সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়েছেন।

বামফ্রন্টের সঙ্গে তৃণমূলের একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে পাওয়ার সেক্টরের সংস্কার সাধন ব্যতীত রাজ্যের উন্নয়নে বামফ্রন্ট আর প্রায় তেমন কিছুই করে নি। তেমন কোনো সামাজিক প্রকল্পেও হাত দেয় নি। কিন্তু তৃণমূল কিছু প্রকল্প রূপায়ণ করেছে। বেশ কিছু পরিকাঠামো গঠনের কাজও তারা করেছে। কিন্তু সেসব করতে গিয়ে পদ্ধতিগতভাবে তারা এতটাই স্বেচ্ছাচারী ও অগণতান্ত্রিক হয়েছে যে সামাজিক উন্নয়নের নামে রাজ্যের কোষাগারের হাল বেহাল হয়ে পড়েছে। রাজ্যে আইনের শাসন ব্যক্তির শাসনে পরিণত হয়েছে। অমিত মিত্র তাঁর বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই 'দ্য ইকোনমিস্ট' পত্রিকার রেফারেন্স দিয়ে সমালোচনা করেছেন যে গ্লোবাল ডেমোক্রেসি ইনডেক্সে ভারত অন্যান্য সমস্ত দেশের মধ্যে ১০ ধাপ নেমে গিয়েছে। অর্থমন্ত্রী যা চেপে গিয়েছেন তা হল এই যে ভারতবর্ষে যদি গণতন্ত্রের অবনতি হয়ে থাকে তবে তার পিছনে ভারতের অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অবদান নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি কারণ এ রাজ্যে বিরোধী রাজনীতি করার অপরাধে মরতে হয়েছে অজস্র মানুষকে। তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বয়স ২৪ এর কম। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যা চলছে তা যে গণতন্ত্র নয় সে কথা বললে অতিকথন হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন এমন একটি লেজিসলেশন যেটি গণতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয়ে চলবে, তাতেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ভাগ্য ফেরার সম্ভাবনা। দলতন্ত্র ও ব্যক্তিতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গের অসুখের মূল কারণ। প্রকৃত ইতিবাচক ও সমন্বয়পূর্ণ গণতন্ত্রই এ অসুখ সারাতে পারে। নজর থাকতে হবে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের দিকে, ভোটব্যাঙ্কের দিকে নয়।

মানুষের নয়, চমকের বাজেট

অভিরূপ ঘোষ

সিঙ্গুর পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে শেষ এক দশকে উল্লেখযোগ্য কোনও বড় শিল্প আসেনি। মাঝারি শিল্পও হাতেগোনা। রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা বাধ্য হচ্ছে বাইরের রাজ্যে কাজ করতে চলে যেতে। এই অবস্থায় আবার যদি বড় শিল্পের উপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় রাজ্য সরকার, সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-অন্ধকার আগামীতেও কাটার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। হ্যাঁ, শেষ কয়েক বছরে রাজ্যে বড় বড় শিল্প সম্মেলন হয়েছে। লক্ষ-লক্ষ, কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাবও এসেছে বলে শোনা যায়। কিন্তু, বিধানসভায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে এই ক'বছরে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বাইশ হাজার কোটির সামান্য বেশি। যদিও সেই বিনিয়োগটাও ঠিক কোথায় এবং কোন ক্ষেত্রে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য সামনে আসেনি। আসলে স্পষ্টতার অভাব সর্বত্র। রাজ্য সরকারের হাতে তথ্যমিত্র কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও নতুন করে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র খোলার কথা বলা হয়েছে। দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী, এখনও তা বোঝা যাচ্ছে না। যেমন মুদ্রা যোজনার মতো একটি কেন্দ্রীয় সরকারি শক্তিশালী প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও বাংলার বেকার যুবক-যুবতীদের লোন দেওয়ার জন্য পৃথক প্রকল্প আনার অর্থও পরিষ্কার নয়। একদিকে কথায় কথায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা তুলব আর অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পগুলোকে রাজ্যের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেব না, এটা কী ধরনের দ্বিচারিতা!

দীর্ঘদিনের বিবাদ ভুলে মন্ত্রীমহোদয় রাজ্যপালের কাছে গিয়েছিলেন বাজেট অধিবেশন শুরুর ঠিক আগে। উদ্দেশ্য সরকারের লেখা ভাষণটাই যেন রাজ্যপাল পড়েন বিধানসভায় সেটা নিশ্চিত করা। কাজ হয়েছিল তাতে। সংঘর্ষের আবহ ভুলে মহামহিম রাজ্যপাল প্রথামাফিক এসেছিলেন বিধানসভায়। সেই বক্তৃতাই দিয়েছিলেন যেটা রাজ্য সরকার লিখে দিয়েছিল আর তারপর হাসিমুখে ছবি তুলে ফিরে গিয়েছিলেন রাজভবনে। কিন্তু হাসিমুখ আর টিকলো কোথায়! রাজ্যপালের ভাষণের কোনও সরাসরি সম্প্রচার করতে দেননি স্পিকার। হয়তো ভয় পেয়েছিলেন যে শেষ মুহূর্তে আত্মসম্মান জেগে উঠতে পারে রাজ্যপালের। তাই মিডিয়াকেও যথাসম্ভব দূরে রেখেছিলেন। কিন্তু,জগদীপ ধনখড়ের ভাষণের তিনদিন পর যখন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বাজেট পেশ করলেন বিধানসভায়, তখন গোটা রাজ্য দেখলো এবং শুনলো ২০২১ বিধানসভার অলিখিত ইলেকশন ম্যানিফেস্টো। ভাগ্যিস সরাসরি সম্প্রচার হয়েছিল বাজেট বক্তৃতার। নয়তো রাজ্যের জনগণ জানতেও পারতো না যে অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা শুরু হয়ে যাওয়ার পরেও নজীরবিহীনভাবে সদস্যদের কাছে এসে পৌঁছায়নি বাজেট পুস্তিকা। অবশ্য বই আসতে দেরি হয়ে বিশেষ অপকার হয়নি। কারণ আবারো নজীরবিহীনভাবে বাজেট পুস্তিকার বাইরে কোনো একটা কাগজ থেকেই ভাষণের একটা বড় অংশ পড়েন অর্থমন্ত্রী। যাক এসবের ব্যাপক প্রতিবাদ করার সংখ্যা বিরোধীদের বিশেষ ছিল না। তাই শেষমেশ ২,৫৫,৬৭৭ কোটির বাজেট পেশ করে নির্বিঘ্নেই সাংবাদিক সম্মেলনে পৌঁছে যান অর্থমন্ত্রী। বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই সেখানে অর্থমন্ত্রীর চেয়ে বেশি ফোকাস কেড়ে নেবেন মুখমন্ত্রী। কারণ ওটাই আসল জিনিস গোটা বাজেটের। বিধানসভা ভোটের আগে এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। সুতরাং প্রচার-প্রসার স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বাজেটের মতো মহা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যে শেষমেশ এমন গিমিক হয়ে যাবে সেটা হয়তো রাজ্যবাসী ভাবতেই পারেনি।

প্রথম চমক ইলেকট্রিক বিল মুকুব। রাজ্য বাজেটে সরকার ত্রৈমাসিকের হিসাবে যারা ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন তাদের বিদ্যুতের বিল মুকুব করে দিয়েছে। সরকারি হিসাবে এরকম লাইফলাইন কনজিউমারের (অর্থমন্ত্রী বলেছেন যারা তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তারাই লাইফলাইন কনজিউমার) সংখ্যা ৩৫ লক্ষ যাদের বিদ্যুতের বিল দিতে হবে না। সমস্যা এখানেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার ওয়েবসাইট অনুযায়ী যারা তিন মাসে ১০২ ইউনিট বা তার থেকে কম বিদ্যুৎ খরচ করেন তাদের বলে লাইফলাইন কনজিউমার এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে সংখ্যাটা ৫৪ লক্ষ। অর্থাৎ, সংজ্ঞাও ভুল, সংখ্যাও ভুল। সবথেকে বড় কথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রকল্প চালু করলেও দু'জায়গায় আকাশ-পাতাল ফারাক। দিল্লি সরকার প্রতিমাসে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছাড় দেয়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেবে তিন মাসে ৭৫ ইউনিট। পদার্থ বিজ্ঞানের সামান্য জ্ঞান থাকলেই বোঝা যায়, একটা টিউবলাইট এবং একটা ফ্যান থাকলেই কোনও বাড়ির ত্রৈমাসিক বিল পঁচাত্তর ইউনিট ছাড়িয়ে যাবে এবং গৃহকর্তাকে বিদ্যুতের পুরো দাম দিতে হবে। অর্থাৎ, লোকজন বসবাস করে এমন বাড়িতে এই ছাড় প্রায় কোনও কাজেই লাগবে না। হয়তো সে কথা ভেবেই, এর জন্য বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ২০০ কোটি টাকা, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের এক-পঞ্চমাংশ জনসংখ্যার রাজ্য দিল্লিতে বাজেট বরাদ্দ আঠেরোশো থেকে দু'হাজার কোটি টাকা। মজার ব্যাপার হল ভারতবর্ষের রাজ্যগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ইউনিট পিছু ইলেকট্রিক বিলে এমনিতেই একদম উপরের দিকে। তার ওপর পশ্চিমবঙ্গে বিল নেওয়া হয় সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে। যার ফলে 'হায়ার স্ল্যাবে' পৌঁছে গিয়ে ইউনিট পিছু বিদ্যুতের দাম এমনিতেই বেশি হয়ে যায় অনেকটা। মোদ্দা কথা অনেকটা শুষে নিয়ে অল্প একটু ছড়িয়ে দেওয়ার গিমিকটারই অন্য নাম 'হাসির আলো'।

পরবর্তী দুই প্রকল্প 'বাংলাশ্রী' এবং 'কর্মসাথী'। একটি প্রকল্পে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অপর প্রকল্পে বেকার যুবক-যুবতীদের সহজ শর্তে লোন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে অন্য অনেক বারের মতো এবারেও বড় শিল্পের জন্য বাজেটে কোনও ঘোষণা নেই। রাজ্য সরকার মনে করেছে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে কর্মসংস্থান বেশি হয়। তাই এগুলোই বেশি লাভজনক। এখন প্রশ্ন হল, যে কোনও শিল্পের জন্য দরকার বাজার এবং বাজার নির্ভর করে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উপর। যেখানে রাজ্যে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশ নিম্নগামী, সেখানে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প চলতে পারে কি!

পশ্চিমবঙ্গ বাজেট ২০২০ : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

আসা যাক বিদ্যাবিদ্যালয় স্থাপনে। শেষ আট বছরে রাজ্য সরকার দিকে দিকে অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। পরিবর্তনের পর এরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়েছে (১২ থেকে ৪২)। সংখ্যা বেড়েছে ঠিক, কিন্তু যোগ্যতা মান বেড়েছে কি? প্রশ্ন ওঠে কারণ, নতুন স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে না আছে পরিকাঠামো, না আছে শিক্ষক আর না আছে যথেষ্ট ফান্ড। এই অবস্থায় আরও তিনটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় (যাদের জন্য বরাদ্দ মাত্র ৫০ কোটি) কী উপকারে আসবে, সেটা বোঝা দায়! অবাক করা কথা হল, একদিকে তৃণমূল সরকার যখন বিজেপিকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ ইমেজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট,তখন অন্যদিকে সেই সরকারই জাতি এবং ধর্মের ভিত্তিতে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে সাম্প্রদায়িকতার ভাবনাকে উস্কে দেয়। এবারের বাজেট ঘোষণা পত্র দেখলেই খুব সহজে বোঝা যায়, কীভাবে 'মতুয়াদের জন্য', 'মুসলিমদের জন্য' বা 'হিন্দিভাষীদের জন্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। নতুন প্রস্তাবিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ও যথাক্রমে 'তপসিলি জাতি', 'তপসিলি উপজাতি' এবং 'অন্যান্য অনগ্রসর জাতি'-দের জন্য তৈরি হবে বলে বাজেট ঘোষণা পত্রে উল্লেখ করেছে সরকার। শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়কে এইভাবে জাতির ভিত্তিতে ভেঙে দেওয়া আসলে শিক্ষার মেরুদন্ডেই আঘাত করা।

অবাক করা কথা হল, অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী, বড় কলকারখানা হলে তবে তার অনুসারী শিল্প হিসেবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পগুলোর রমরমা দেখা যায়। সিঙ্গুর পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে শেষ এক দশকে উল্লেখযোগ্য কোনও বড় শিল্প আসেনি। মাঝারি শিল্পও হাতেগোনা। রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা বাধ্য হচ্ছে বাইরের রাজ্যে কাজ করতে চলে যেতে। এই অবস্থায় আবার যদি বড় শিল্পের উপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় রাজ্য সরকার, সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-অন্ধকার আগামীতেও কাটার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। হ্যাঁ, শেষ কয়েক বছরে রাজ্যে বড় বড় শিল্প সম্মেলন হয়েছে। লক্ষ-লক্ষ, কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাবও এসেছে বলে শোনা যায়। কিন্তু, বিধানসভায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে এই ক'বছরে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বাইশ হাজার কোটির সামান্য বেশি। যদিও সেই বিনিয়োগটাও ঠিক কোথায় এবং কোন ক্ষেত্রে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য সামনে আসেনি। আসলে স্পষ্টতার অভাব সর্বত্র। রাজ্য সরকারের হাতে তথ্যমিত্র কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও নতুন করে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র খোলার কথা বলা হয়েছে। দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী, এখনও তা বোঝা যাচ্ছে না। যেমন মুদ্রা যোজনার মতো একটি কেন্দ্রীয় সরকারি শক্তিশালী প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও বাংলার বেকার যুবক-যুবতীদের লোন দেওয়ার জন্য পৃথক প্রকল্প আনার অর্থও পরিষ্কার নয়। একদিকে কথায় কথায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা তুলব আর অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পগুলোকে রাজ্যের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেব না, এটা কী ধরনের দ্বিচারিতা! এতে তো আখেরে রাজ্যের মানুষেরই ক্ষতি। বাজেট ঘোষণা সেটাকেই আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। একই কথা বলা যায় 'চা সুন্দরী' নামের প্রকল্পকে নিয়েও। কেন্দ্র ও রাজ্যের নিজস্ব আবাস প্রকল্প থাকতেও আবার নতুন করে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার ঘোষণা দ্বিচারিতা আর চমকেরই নামান্তর।

এরপর 'বন্ধু' আর 'জয় জোহার' প্রকল্প। প্রথম প্রকল্পে তপসিলি জাতির ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেককে মাসে ১০০০ টাকা করে বার্ধক্যভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেছে সরকার। দ্বিতীয় প্রকল্প অর্থাৎ, 'জয় জহার' একই রকমের উদ্যোগ তপসিলি উপজাতিদের জন্য। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, পাহাড় এবং জঙ্গলমহলে লোকসভা ভোটের ভাঙনকে রোধ করতেই এই উদ্যোগ। কিন্তু প্রশ্ন হল, যেখানে ইতিমধ্যেই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বার্ধক্যভাতা প্রকল্প আছে, সেখানে নাম বদলে নতুন একটা প্রকল্প আনার অর্থ কী? তা ছাড়া ক্রয়ক্ষমতা না বাড়িয়ে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি না করে এই ধরনের পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি আদতে যে তপসিলি জাতি এবং উপজাতির মানুষদের সমূহ ক্ষতি করবে, সেটা সহজেই অনুমেয়।

আসা যাক বিদ্যাবিদ্যালয় স্থাপনে। শেষ আট বছরে রাজ্য সরকার দিকে দিকে অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। পরিবর্তনের পর এরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়েছে (১২ থেকে ৪২)। সংখ্যা বেড়েছে ঠিক, কিন্তু যোগ্যতা মান বেড়েছে কি? প্রশ্ন ওঠে কারণ, নতুন স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে না আছে পরিকাঠামো, না আছে শিক্ষক আর না আছে যথেষ্ট ফান্ড। এই অবস্থায় আরও তিনটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় (যাদের জন্য বরাদ্দ মাত্র ৫০ কোটি) কী উপকারে আসবে, সেটা বোঝা দায়! অবাক করা কথা হল, একদিকে তৃণমূল সরকার যখন বিজেপিকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ ইমেজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট,তখন অন্যদিকে সেই সরকারই জাতি এবং ধর্মের ভিত্তিতে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে সাম্প্রদায়িকতার ভাবনাকে উস্কে দেয়। এবারের বাজেট ঘোষণা পত্র দেখলেই খুব সহজে বোঝা যায়, কীভাবে 'মতুয়াদের জন্য', 'মুসলিমদের জন্য' বা 'হিন্দিভাষীদের জন্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। নতুন প্রস্তাবিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ও যথাক্রমে 'তপসিলি জাতি', 'তপসিলি উপজাতি' এবং 'অন্যান্য অনগ্রসর জাতি'-দের জন্য তৈরি হবে বলে বাজেট ঘোষণা পত্রে উল্লেখ করেছে সরকার। শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়কে এইভাবে জাতির ভিত্তিতে ভেঙে দেওয়া আসলে শিক্ষার মেরুদন্ডেই আঘাত করা।

সত্যি বলতে কি, সরকার শিক্ষার ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস তা বাজেট বিবৃতি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। আগের বছর উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছিল ৩৯৬৪ কোটি টাকা। এবছর বরাদ্দ কমে দাঁড়াল ৭০০ কোটি (যদিও অন্যত্র অন্য হিসাব দিয়েছে সরকার এবং অর্থবিল পাশও হয়েছে অন্য অঙ্কের অর্থ পরিমাণ)। অন্য দিকে, স্কুল শিক্ষায় গতবারের বরাদ্দ ২৭৫৪০ কোটি টাকা হলেও এবারে বরাদ্দ মাত্র ৮৭৫০ কোটি (এক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, তিন জায়গায় তিন রকম তথ্য)। যেখানে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক বিষয়গুলোয় বরাদ্দ বাড়ার কথা, সেখানে এই অভূতপূর্ব বরাদ্দ হ্রাস (যদি বাজেট-বিবৃতিকে সঠিক ধরা হয়) সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দেয়।

সবশেষে ধরা যাক সেই পুরনো কথা— কেন্দ্রীয় বঞ্চনা আর বাম আমলের লোন। পাঠকের উপর বিচারের ভার ন্যস্ত করে দুটো তথ্য দিয়ে শেষ করা যাক। আগে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের ২৯ শতাংশ পেত রাজ্য এখন প্রায় ৪২ শতাংশ। বাম আমলের শেষে (২০১১) রাজ্যের উপর মোট দেনার বোঝা ছিল এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা। আগামী অর্থবর্ষের শেষে যা হতে চলেছে কমপক্ষে চার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার কোটি টাকা। কে ঠিক আর কে ভুল আর রাজ্যই বা কোন দিকে চলেছে বিচারের দায়িত্ব এবার আপনার।

সৌজন্য: দৈনিক সংবাদপত্র 'একদিন'

বেহাল বাজেট

সৌরভ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির বেহাল অবস্থা। তার মধ্যেও বাংলায় দ্বিগুণ আর্থিক বৃদ্ধির দাবি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের মুখে। গত সোমবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতার লাইন সহযোগে যে বাজেট পাঠ করলেন, তা যে নিছক অশ্বডিম্ব প্রসব, তা বুঝলেন কয়জন নেতা বা নেত্রী? বাজেটে রীতিমতো কল্পতরু হতে চাইলেন অমিত-মমতা জুটি। গরিবের হাতে আয় থেকে কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ বিলে সাশ্রয় থেকে চা-বাগানে আবাসন, মোটর ভেহিকেল আইনে জরিমানা মকুব, তপসিলি জাতির প্রবীণদের জন্য মাসে ১০০০ টাকা পেনশনের ঘোষণা যেন অনেক প্রাপ্তি। বিরোধীরা সব শুনে বললেন যে, 'বন্ধু' প্রকল্প তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের কাছে কাটমানি খাওয়ার প্রকল্প, কর্মসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ পাবে তৃণমূল কর্মীরা, 'হাসির আলো' বাজেটে ৭৫ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রকল্প শুধু বিদুৎ চুরির লাইসেন্স। এই যদি বিরোধী নেতাদের বাজেট বোধ হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলের রাজনীতিকদের মেধা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠবেই। কিন্তু, তাঁরা লক্ষ্য করলেন না যে, কৃষি ও কৃষি বিপণণে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

'রাজ্যের কৃষকরা খুব ভালো আছেন। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিগুণ করার কথা বলেছে। আমরা তার আগেই কৃষকের আয় ট্রিপল (তিনগুণ) করে দিয়েছি'। সোমবার বাজেট পেশের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা বলেছেন। যদিও এবারের বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র রাজ্যে কৃষকের আয় কত, তা নিয়ে কোনও উল্লেখ করেননি। ২০১১-র তুলনায় রাজ্যের কৃষকের আয় তিনগুণ বেড়েছে, এই ঘোষণা গতবছর করা হয়েছিল। জানানো হয়েছিল, রাজ্যের কৃষকের আয় ২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা পেরিয়ে গিয়েছে। এবার, একবছর পরও তা সেই 'ট্রিপল'-ই আছে। অন্তত সরকারই তেমনই দাবি করছে। রাজ্যে কি তবে কৃষকের আয় থমকে আছে? জবাব নেই বাজেটে। তবে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট অনেক ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ কমানো হয়েছে। গ্রামে বড় অংশের মানুষ কৃষক। তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কোনও ঘোষণা বাজেটে নেই। ফসলের দাম যাতে কৃষক পান, তা নির্দিষ্ট করার দিশাও নেই। গ্রামের মন্দা, কৃষি সংকট মোকাবিলার কোনও দিশা বাজেটে রাখতে পারেননি মমতার সরকার। সামনেই পৌরসভার ভোট। পৌর এলাকায় কৃষিকাজ হয় খুবই সামান্য। সামনে পঞ্চায়েত ভোট নেই। বিধানসভা নির্বাচনের আগে আর একটি (পূর্ণাঙ্গ না হলেও) বাজেট পেশের সুযোগ পাবে তৃণমূল কংগ্রেস। পরিস্থিতি বিবেচনা করে গত বছরের তুলনায় বাজেট কমিয়ে দিলেন 'কৃষক দরদি' রাজ্য সরকার। গতবছর বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৬০৮৬ কোটি টাকা। এবার সেখানে বরাদ্দ হয়েছে ৫৮৬০ কোটি ৫৭লক্ষ টাকা। কৃষি বিপণনের ক্ষেত্রে গতবছর বরাদ্দ হয়েছিল ৩৫৯ কোটি টাকা। এবার তা করা হয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা। সব জিনিসের দাম বাড়ছে। ফসল উৎপাদনে যতটুকু সহায়তা রাজ্য সরকারকে করতে হয়, তারও দাম বেড়েছে একবছরে। সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু সরকারের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে বাজেটে। এবং তা হল, সরকার মনে করছে, কৃষি ও কৃষি বিপণনে বরাদ্দ আরও কম রাখলে হবে। শুধু কি তাই? 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৮-র ৩১ ডিসেম্বর। ২০১৯-র ১ ফেব্রুয়ারি তার কাজ শুরু হয়। ঘোষণার দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজ্যের ৭২ লক্ষ কৃষক ও ভাগচাষির জন্য এই প্রকল্প। একবছর পর, বাজেটে রাজ্য জানাচ্ছে, ৩৯ লক্ষ ৫১ হাজার ৮০০ কৃষককে এই প্রকল্পের আওতায় আনা গিয়েছে।

অর্থাৎ, প্রায় ৪৮ শতাংশ কৃষিজীবী এর আওতার বাইরে। একবছরে সরকার এদের কাছে পৌঁছতেই পারেনি। খরিফ মরশুমের হিসাব দিয়েছে সরকার। প্রতি কৃষককে একেকবার (খরিফ, রবি) ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার কথা। সরকার দিয়েছে গড়ে ১৫৬৯ টাকা ৪৯ পয়সা করে গড়ে। খরচ হয়েছে ৬২০ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। অথচ, মমতা বন্দ্যোপাধায় প্রকল্প ঘোষণার দিন বলেছিলেন— এই প্রকল্পে ১০ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। তাহলে এক মরশুমে অন্তত ৫০০০ কোটি টাকা হওয়ার কথা। হয়নি। খরচ হয়েছে ঘোষণার ১০ শতাংশর সামান্য বেশি। বরাদ্দ কমানো হয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ফুলচাষ দপ্তরের জন্য। তা গত বছর ছিল ১৯০ কোটি টাকা। এবার করা হয়েছে ১৮৫ কোটি টাকা। মৎস্য বিভাগের ক্ষেত্রে একইভাবে বরাদ্দ ৪৫২ কোটি টাকা থেকে ৩৪০ কোটি টাকাতে নামানো হয়েছে। একইভাবে সেচ ও জলপথ দপ্তরের বাজেট কমানো হয়েছে ৩১৮৫ কোটি টাকা থেকে ২৮২০ কোটি টাকায়। অর্থাৎ, কৃষিসংশ্লিষ্ট প্রায় সব ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার।

বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা কি মন দিয়ে পড়াশোনা করে বাজেট নিয়ে কথা বলবেন দয়া করে? সেটা করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝতে পারবেন যে, তাঁদের প্রতিনিয়ত 'চিট' করছে চিটফান্ড-কাণ্ডের খলনায়কেরা।

'কৃষক বন্ধু' প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৮-র ৩১ ডিসেম্বর। ২০১৯-র ১ ফেব্রুয়ারি তার কাজ শুরু হয়। ঘোষণার দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজ্যের ৭২ লক্ষ কৃষক ও ভাগচাষির জন্য এই প্রকল্প। একবছর পর, বাজেটে রাজ্য জানাচ্ছে, ৩৯ লক্ষ ৫১ হাজার ৮০০ কৃষককে এই প্রকল্পের আওতায় আনা গিয়েছে। অর্থাৎ, প্রায় ৪৮ শতাংশ কৃষিজীবী এর আওতার বাইরে। একবছরে সরকার এদের কাছে পৌঁছতেই পারেনি। খরিফ মরশুমের হিসাব দিয়েছে সরকার। প্রতি কৃষককে একেকবার (খরিফ, রবি) ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার কথা। সরকার দিয়েছে গড়ে ১৫৬৯ টাকা ৪৯ পয়সা করে গড়ে। খরচ হয়েছে ৬২০ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। অথচ, মমতা বন্দ্যোপাধায় প্রকল্প ঘোষণার দিন বলেছিলেন— এই প্রকল্পে ১০ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। তাহলে এক মরশুমে অন্তত ৫০০০ কোটি টাকা হওয়ার কথা। হয়নি। খরচ হয়েছে ঘোষণার ১০ শতাংশর সামান্য বেশি। বরাদ্দ কমানো হয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ফুলচাষ দপ্তরের জন্য।

সৌজন্য: দৈনিক 'একদিন' সংবাদপত্র

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট ২০২০-কিছু অসত্য ও অর্ধসত্যের বিবরণী

সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায়

রাজ্যের বাজেট ভাষণ ২০২০, অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ। ২০১১ সালে থেকেই লাগাতার, বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে বাজেট বক্তৃতা থাকে সীমাহীন মিথ্যাচার।

১। শিল্প ও কর্মসংস্থান।

১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ছিল দেশের সর্বোচ্চ ১১.৬ শতাংশ; যা বর্তমানে ৫.৮ শতাংশ এবং রাজ্যের স্থান ষষ্ঠ। মাথাপিছু নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হিসাবে এই রাজ্যের স্থান ২৫ তম। একই সময়ে মোট কল কারখানার সংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান থেকে নেমে এসেছে নবম স্থানে। শিল্পে কর্মসংস্থানের বিচারে তৎকালীন বোম্বে প্রদেশের পরেই দ্বিতীয় স্থানের গৌরবোজ্জ্বল স্থান থেকে নেমে এসে রাজ্য আজ দাঁড়িয়ে নবম স্থানে। ১৯৫১ সালে দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ হত এই রাজ্যে, যা ১৯৮২-৮৩ তে নেমে আসে ৮.৬ শতাংশে, এবং ২০১৬-১৭ তে ৫ শতাংশে তথা অষ্টম স্থানে। রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের এই দূরবস্থা সত্ত্বেও, বাজেট বক্তৃতা সেটিকেই সাফল্য হিসাবে দেখিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। আবার, রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের নিতান্ত অনুমানকে বাস্তব অবস্থা হিসাবে বাজেট বক্তৃতা উল্লেখ করা হয়েছে; যা সম্পূর্ণ অবান্তর।

শিল্পের অন্যতম প্রধান শর্ত হল বিদ্যুতের যোগান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সভায় দাবী করেন যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাজ্য নাকি দারুন উন্নতি করেছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাথাপিছু বিদ্যুৎ যোগানের নিরীখে ২০১৭-১৮ সালের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সমগ্র দেশের মধ্যে ২৯ তম (৫৫৪ কিলোওয়াট ঘন্টা)। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার নিরীখে এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৪ তম (১০৫১৮ মেগাওয়াট)! বিদ্যুতের পাশাপাশি শিল্পের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অপরটি হল সড়ক। রাজ্য সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৩৬১২ কিমি; এবং এই প্রশ্নে স্থান সমগ্র দেশের মধ্যে ১৪ তম। ২০১৭-১৮ সালের হিসাবে মোট মূলধনী ব্যয়ের হিসাবে রাজ্য সপ্তম স্থান আছে। অর্থাৎ, যে পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনতার সময় ছিল দেশের সব চাইতে শিল্পোন্নত রাজ্য, কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূল শাসনের ৭২ বছরের পাপের ফলে, তা আজ বহু পিছনের সারিতে। ব্যবসার অনুকূল পরিবেশের নিরীখে পশ্চিমবঙ্গ'র স্থান দশম। রপ্তানিতে রাজ্যের নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী রাজ্য নবম স্থানে। বিস্ময়করভাবে বাজেট বক্তৃতায়, অর্থমন্ত্রী দাবী করেছেন যে, ব্যবসার অনুকূল পরিবেশের নিরীখে পশ্চিমবঙ্গ'র স্থান নাকি প্রথম। অর্থাৎ বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিভাবে এই রাজ্য সরকার তথ্যের কারচুপী করে থাকে।

শাসক দলের মদতে চলতে থাকা সিন্ডিকেট ব্যবসা, এবং সরকারী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে তোলাবাজি বা কাটমানি'র রমরমা চলতে থাকায়, শিল্পপতিরা এই রাজ্যে বিনিয়োগে আসতে চা না। ভূমি বা জমি-রেজিস্ট্রেশন দপ্তরের কাজে দুর্নীতি এবং স্বচ্ছতার অভাব তথা দীর্ঘসূত্রীতা শিল্পপতিদের অনুৎসাহিত করে। প্রসঙ্গতঃ পুলিশ তথা দুইটি দপ্তরই আবার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আছে। মেলা, উৎসবে অর্থ অপচয়ের ফলে, ঋণে জর্জরিত সরকার আয় বৃদ্ধির জন্য জমি বাড়ির স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি, বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধি করে চলেছে, যা শিল্পপতিদের অনুৎসাহিত করছে। শিল্প তথা কর্মসংস্থান হচ্ছে না। ফলতঃ শিক্ষিত যুবক যুবতীদের কাজের খোঁজে পারি দিতে হয় ভিনরাজ্যে। কিন্তু দল বাঁচানোর স্বার্থে, এই সিন্ডিকেট বাজ, তোলাবাজ বা কাটামানিনিখোরদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। বাজেট বক্তৃতায় এ নিয়ে একটি শব্দ ব্যয় হয় না। অপরদিকে কর্মসংস্থান নিয়ে মিথ্যা ভাষন থাকে বাজেট বক্তৃতায়। এই সরকারের আমলে কোন কোন শিল্পে কমসংস্থান হয়েছে, তার

শিল্পের অন্যতম প্রধান শর্ত হল বিদ্যুতের যোগান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সভায় দাবী করেন যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাজ্য নাকি দারুণ উন্নতি করেছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাথাপিছু বিদ্যুৎ যোগানের নিরীখে ২০১৭-১৮ সালের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সমগ্র দেশের মধ্যে ২৯ তম (৫৫৪ কিলোওয়াট ঘন্টা)।

কোন উল্লেখ বাজেট বক্তৃতায় নেই। অর্থমন্ত্রী দাবী করেছেন ৪ লক্ষ ৪৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের। কিন্তু বলেননি কোথায় হয়েছে, কোন কোন সংস্থা করেছেন এই সমস্ত বিনিয়োগ! এই প্রচারলোভী সরকার এমন কোন বিষয়, যাতে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবার সম্ভাবনা আছে, তা নিয়ে নিশ্চুপ থাকবেন, তা হতে পারে না। অর্থাৎ, বিনিয়োগের যে কথা বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভাঁওতা।

মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় কেন্দ্রের অসহযোগীতার থা বলেন। অথচ, বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারী শিল্প স্থাপনে উদ্যোগীরা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন; যা কিনা ভারতে সর্বোচ্চ। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপন বা কর্মসংস্থানের প্রশ্নে কেন্দ্রের পূর্ণ সহযোগীতা থাকলেও; শাসক দলের মদতে চলা সিন্ডিকেট ব্যবসা, তোলাবাজি ও কাটমানির জেরে প্রয়াসগুলি ব্যর্থ হচ্ছে। ২০১১ সালের পর, বাজেট বক্তৃতা অনুযায়ী, রাজ্যে নাক বেকার ৪০ শতাংশ হ্রাদ পেয়েছে। এই তথ্য অর্থমন্ত্রী কোথায় পেলেন? সাহস থাকলে প্রতি পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির প্রতিটি ওয়ার্ডে কোন কোন বেকার এই সরকারের সময়ে চাকরি পেয়েছেন, সাহস থাকলে সেই তথ্য প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে দেওয়াই হোক। রাজ্য সরকারের অধীনে প্রায় লক্ষাধিক গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদ ফাঁকা। কিছু বেকার ছেলে মেয়ের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এই সরকার নামমাত্র টাকায়, চুক্তির ভিত্তিতে, তাদের দিয়ে উদাস্ত পরিশ্রম করাচ্ছে। কিন্তু নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধ। বাজেট বক্তৃতা এ সম্পর্কে চুপ।

২। কৃষি

এই রাজ্যে কৃষি নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তির চাষী; এবং রেকর্ডেড বর্গাদারদের হাতে আছে। এই অংশ মূলতঃ দারিদ্রের কারনে, আধুনিক কৃষির ঝুঁকি গ্রহণ করতে ভয় পান; এবং চিরাচরিত পদ্ধতির চাষে আবদ্ধ আছেন। পাশাপাশি কৃষি উপকরণ যেমন সার, বীজ, পরামর্শ সহ যন্ত্রাদির অপ্রতুলতা, প্রশিক্ষন, ঋন, বীমা'র অভাব; অভাবী বিক্রি, প্রভৃতি কারণে চাষ থেকে যথেষ্ট লাভ হচ্ছে না। বীজের প্রশ্নে এই রাজ্য এখনো অন্য রাজ্য বিশেষতঃ পাঞ্জাবের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ফসল মজুত রাখার ও প্রক্রিয়াকরণের পরিকাঠামোর অভাবে এক বিরাট অংশের ফুল, ফল, সব্জী নষ্ট হচ্ছে; অথবা চাষী অলাভজনক দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। গবাদি প্রাণীপালক উৎপাদিত দুধের যে দাম পাচ্ছেন, তা খোলাবাজার দুধের বিক্রয়মূল্যের প্রায় অর্ধেক। সঠিক দাম না পেয়ে প্রাণীপালক অনুৎসাহিত হয়ে গাভী পালন ছেড়ে দিচ্ছেন। ফলে বাজারে ভেজাল দুধের কারবার বেড়ে চলেছে, যা জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে বিপদজনক। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে গরু চুরি, গবাদি প্রাণীপালনের অন্য বড় বাধা। বহু প্রাণীপালক এর ফলে গাভী পালন ছেড়ে দিচ্ছেন। এই চুরিতে শাসক দলের নেতৃত্ব, শাসক দলের জনপ্রতিনিধি ও পুলিশের অংশিদায়িত্ব আছে, তাই চুরির অভিযোগগুলি থানা গ্রহণ করে না।

এই সমস্যাগুলর সমাধানের কোন উদ্যোগ বর্তমান সরকারের বাজেট

বক্তৃতা নেই। আছে কিছু মিথ্যা তথ্য। সরকারের দাবী, এই সময়ের কৃষকের আয় নাকি তিনগুণ বেড়েছে! সরকারের কাছে আবেদন, প্রতি পঞ্চায়েত এলাকায় কোন কোন কৃষকের আয় তিনগুণ বেড়েছে তার তথ্য জনসমক্ষে আনুন। আর এই তথ্যও প্রকাশ করা হোক কত কৃষক সরকারি সহায়তা না পেয়ে এই সময়ে, চাষ ছেড়েছেন; আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। এই সরকার, প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধা থেকে রাজ্যের সমস্ত কৃষক পরিবারকে বঞ্চিত করছে। এই বাজেট, বিগত বছরের চাইতে, ক্ষুদ্র সেচে ব্যয়বরাদ্দ প্রায় ৩০ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৎস্য চাষ এই হ্রাস প্রায় ২৫ শতাংশ; এবং প্রাণীপালনের ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ কমেছে ৫০ শতাংশ। মেলা, খেলা, আত্মপ্রচারে মগ্ন এই সরকার দরিদ্র কৃষকের প্রতি অত্যন্ত নির্মম।

৩। স্বাস্থ্য

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীই স্বাস্থ্যমন্ত্রী! স্বাস্থ্যের উন্নতি বলতে হয়েছে কিছু নীল সাদা বাড়ি; যাতে না আছেন চিকিৎসক, না আছে পরিকাঠামো। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বেহাল অবস্থার কয়েকটি চিহ্ন নিম্নরূপ ঃ

ক) স্বাস্থ্যক্ষেতের সার্বিক ফলফলের উপর ভিত্তি করে, ২১টি বড় রাজ্যের যে র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৬ তম।

খ) নবজাতক অপুষ্ট শিশু'র অনুপাতের ভিত্তিত দেশের ২১টি বড় রাজ্যের ভিতর এই রাজ্যের স্থান ২০ তম। রাজ্যের ১৬.৪ শতাংশ নবজাতকই অপুটে। বিষয়টি রাজ্যের ভয়াবহ দরিদ্র পরিস্থিতি নিদেশ করে।

গ) স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সমস্ত গর্ভবতী মায়ের যাতে প্রসব হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট কেন্দ্রীয় অনুদান থাকলেও, এই প্রশ্নেরও পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে, দেশের ১৪ তম স্থানে। অথচ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েদের প্রসব হলে মা ও সন্তান উভয়ই সুস্থ থাকবে।

ঘ) জন্ম হবার ২৮ দিনের ভিতর শিশু মৃত্যুর নিরীখে এই রাজ্যের স্থান ১৩তম। প্রতি ১ হাজার নবজাতকের মধ্যে ১৩ জনই জন্ম হবার ২৮ দিনের ভিতর মারা যায়।

ঙ) জন্মের প্রথম ৫ বছরের ভিতর শিশু মৃত্যুর নিরীখে এই রাজ্যের স্থান ৩০ তম। প্রতি ১ হাজার শিশু মধ্যে ৩০ জনই জন্ম হবার ৫ বছরের ভিতর মারা যায়।

চ) শিশুদের টিকাকরণের বিষয়টি এই রাজ্যে অবহেলিত। এই প্রশ্নে রাজ্যের স্থান ৩৩তম।

ছ) যক্ষা রোগীর সংখ্যার বিচারে রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়াবহ। প্রতি ১ লক্ষ মানুষের ১০০ জনই এই মারণ রোগে আক্রান্ত। এই প্রশ্নে রাজ্যের সান, ২১টি বড় রাজ্যের ভিতর ১৮ তম।

জ) রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেহাল দশার মূল কারণ, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৪১ শতাংশ পদে চিকিৎসক না থাকা। এই বিচারে দেশের মধ্যে রাজ্য ১৭ তম স্থানে আছে।

পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চরম অবহেলার ফলস্বরূপ, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া সহ বিভিন্ন রোগ এই রাজ্যে প্রায়ই মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই বাজেটে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বিগত বছরের চাইতে, প্রায় ৫২ শতাংশ কমিয়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে সরকার ঠেলে দিয়েছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ মোট বাজেট বরাদ্দের মাত্র ৩.৭ শতাংশ।

৪ শিক্ষা

স্বাস্থ্যের মতই শিক্ষাক্ষেত্রে ঢক্কানিনাদ অনেক হলেও এক দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে রাজ্য। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের মূল সমস্যাগুলি হল ঃ—

ক) তোষণের ক্ষেত্রে হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে শিক্ষাঙ্গনকে। রামধনু হয়েছে রঙধনু। মাদ্রাসায় খুল্লমখুল্লা চলছে জঙ্গিশিক্ষা, অস্ত্রশিক্ষা। আল-আমিন-মিশনের ছাত্ররা হঠাৎ করে কারিগরি শিক্ষা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ব্যাপক সংখ্যায় সাফল্য হচ্ছে।

খ) পাশাপাশি প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাগুলি হয়ে উঠেছে তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের কাটমানি রোজগারের প্রধান জায়গা। ঘটি বাটি বেচে গরীব বাড়ির ছেলে মেয়েরা এই চাকরির আশায় লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি হিসাবে তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

গ) শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল কোথাও প্রকাশ হচ্ছে না। সফলদের মোবাইলে মেসেজ যাচ্ছে! দেখা যাচ্ছে, যারা পরীক্ষাতেই বসে নি তাদেরও কেউ কেউ শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থাটি আজ রজ্যে কলুষিত।

ঘ) পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকের ব্যাপক ঘাটতি শিক্ষার মানকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত নষ্ট হচ্ছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী উদাসীন। প্রাথমিক ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যার অনুপাতের নিরীখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ৩৬টি রাজ্যের মধ্যে ৩১; উচ্চ-প্রাথমিক ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যার অনুপাতের নিরীখে এই স্থান ৩৫; মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি প্রশ্নে এই স্থান ৩২, উচ্চমাধ্যমক ও কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের স্থান ৩৩! এই সরকার হিন্দু বাঙালীর বিভাজনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই এই বাজেটে তপঃশীলি জাতি ও ওবিসি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা করেছেন। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা থাকলেও, স্কুল শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই সরকারী ব্যয়বরাদ্দ যথাক্রমে ৬৮ শতাংশ ও ৮২ শতাংশ হ্রাদ করার প্রস্তাব আছে বর্তমান বাজেটে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মতই শিক্ষাক্ষেত্রেও বরাদ্দ মোট বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৩.৭ শতাংশ মাত্র।

৫। অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন

হিন্দু অনগ্রসর বাঙালীর উন্নয়নে এই সরকারের কোন আগ্রহ নেই। তারা নির্বাচনে জেতার জন্য মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক ধরে রাখার পাশাপাশি, হিন্দু বাঙালীর বিভাজনে আগ্রহী। তাই নির্বাচনের আগে শেষ বাজেটে অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়নে কিছু চমক রাখার হলেও, সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট টাকা ধরা নেই। এই দপ্তরের ক্ষেত্রে বিগত বছর অপেক্ষা বাজেট বরাদ্দ প্রায় ১৭ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। পাশাপাশি, হিন্দু অনগ্রসর বাঙালীর উন্নয়নে মাত্র ৮০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও, মুসলিম সংখ্যালঘু তোষণের জন্য সেই দপ্তরের বরাদ্দ প্রায় সাড়ে চার গুণ বেশী, ৩৬০০ কোটি টাকা। ব্যয় বরাদ্দে এটা পরিষ্কার, সরকার কাকে বোকা বানাচ্ছে; আর কাদের খুশী করতে চাইছে।

৬। উদ্বাস্তু কল্যাণ

হিন্দু বাঙালী উদাস্তু মানুষ এই সরকারের চরিত্র ধরে ফেলেছেন। আর তাতেই রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছে। এই সরকারের। তাই মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সভা করে মিথ্যার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছেন। কিন্তু হিন্দু অনগ্রসর বাঙালীর উন্নয়নের মতই, এক্ষেত্রেও সরকার হিন্দু বাঙালী উদাস্তুদের সাথে সীমাহীন মিথ্যাচার করছেন। তার প্রমাণ, এই বাজেটে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বরাদ্দ প্রায় ৩৯ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৭। অসংগঠিত শ্রমিক

এই রাজ্যে শিল্প তথা কৃষির দুরবস্থার জন্য এক বিপুল সংখ্যক মানুষ অসংগঠিত শ্রমিক হিসাবে জীবনধারণ করতে বাধ্য হন। এই সরকার তাদের সাথেও নিরন্তর মিথ্যাচার করে চলেছেন। এই শ্রেণীর স্বার্থে কেন্দ্র রচিত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষার প্রকল্প এই রাজ্য সঠিকভাবে রূপায়ন করে না। বর্তমান বাজেটে রাজ্য সরকার এই অংশের জন্য কর্মসূচী ঘোষণা করলেও, এই ধাক্কায় এই দপ্তরের বরাদ্দ প্রায় ৬৬ শতাংশ হ্রাস হয়েছে!

৮। বিপর্যয় মোকাবিলা

বন্যা, অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ বিপর্যয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এই দপ্তরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বর্তমান বাজেট এই দপ্তরের বরাদ্দ প্রায় ৭০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে!

৯। সরকারের আয়

এই সরকারের রাজস্ব থেকে সম্ভাব্য আয়—৫৮০০০ কোটি টাকা; মদ বিক্রি করে রাজস্ব বাবদ সম্ভাব্য আয়—১৩০০০ কোটি টাকা; ঋন—৫৪০০০ কোটি টাকা; কেন্দ্রীয় রাজস্ব ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় অনুদান—১০৮০০০ কোটি টাকা। রাজ্যের মোট ঋন—৪ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা।

অর্থাৎ, আমাদের রাজ্যের প্রতিটি মানুষের মাথায় গড়পড়তা ৫০ হাজার টাকা ঋণের বোঝা আছে। পাশাপাশি, এই সরকারের আয়ের সিংহভাগ আসে কেন্দ্রীয় রাজস্ব ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে। তাই মুখ্যমন্ত্রী যে বঞ্চার কথা বলেন তা নিতান্ত মিথ্যাচার।

১০। সরকারী শিক্ষক, কর্মচারীদের নিদারুণ বঞ্চনা

মুখ্যমন্ত্রীর মিথ্যাচারের অন্যতম বড় শিকার সরকারী শিক্ষক, কর্মচারীরা। ২০১১ সালে সমস্ত বঞ্চনা মিটিয়ে দেবার আশ্বাস দিয়ে শিক্ষক, কর্মচারী সমাজের ব্যাপক অংশের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে, দ্রুত সেই অংশকে ভুলে যায় মুখ্যমন্ত্রী। শুরু হয় ডিএ অনিয়মিত হয়ে যাওয়া। এরপর ২০১৬ সাল থেকে প্রাপ্য পে কমিশন, চার বছর পরে প্রদান করে রাজ্য সরকার। এবং শুরু হয় বঞ্চনার নতুন ইতিহাস, ডিএ শূন্য পে স্লিপ। বর্তমান বাজেটে বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণ অর্থবর্ষের জন্য ডিএ'র কোন সংস্থান নেই।

১১। আরো মিথ্যাচার

বর্তমান বাজেট বক্তৃতায়, অর্থমন্ত্রী সাবলীলভাবে আরো কতগুলি মিথ্যাচার করেছেন।

ক্রম	বক্তৃতায় যা বলা হয়েছে	বাস্তব
১	১০০ দিনের কাজে রাজ্য প্রথম	ক। ১০০ দিনের কাজে নিযুক্ত অদক্ষ শ্রমিকের মজুরী মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গুজরাট সহ অনেকগুলি রাজ্যের চাইতে কম। খ। ২০১৯-২০ তে, ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত, এই রাজ্য লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৬১% পূরন করেছে; এবং এই রাজ্যের স্থান দেশে ২৮ তম। গ। দুর্নীতি হ্রাসের লক্ষে দেশের অধিকাংশ রাজ্য যেখানে স্বাধীন সামাজিক নীরিক্ষন সংস্থা নিয়োগ করেছে, সেখানে এই রাজ্য তা গঠনে কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে না।
২	গ্রামীন আবাস যোজনায় রাজ্য প্রথম	ক। প্রথম পর্য্যায়ের কাজ সম্পূর্ন হওয়ার হিসাবে রাজ্যের স্থান ৫ম। খ। প্রথম পর্য্যায়ের অসম্পূর্ন ঘর ৫৩০০০ এর বেশী। গ। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে উত্তরপ্রদেশ যেখানে লক্ষ্যমাত্রার ৩৯% পূরন করেছে; এই রাজ্য এখনও কাজ আরম্ভ হয়নি। ঘ। সামগ্রিক Performance Index এর বিচারে রাজ্যের স্থান ষষ্ঠ।

১২। বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ (কোটি টাকা)

দপ্তর	ব্যয়বরাদ্দ (কোটি টাকা)			
	2019-20	2020-21	হ্রাস	%
ক্ষুদ্র সেচ	1307	925	382	29.23
মৎস্য চাষে	452	340	112	24.78
প্রানীপালন	1115	565	550	49.33
স্বাস্থ্য	9556	4608	4948	51.78
স্কুল শিক্ষা	27540	8750	18790	68.23
উচ্চ শিক্ষা	3964	700	3264	82.34
অনগ্রসর শ্রেনী উন্নয়ন	966	805	161	16.67
উদ্বাস্তু কল্যান	1613	985	628	38.93
শ্রমিক কল্যান	959	425	534	55.68
বিপর্যয় মোকাবিলা	703	215	488	69.42

একটি প্রতিশ্রুতিমুখর বাজেট ও রাজ্যের দিশাহীন অর্থনীতি

প্রণব মসন্ত

বিগত আট বছরের মতো এবারও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অমিত মিত্র একটি প্রতিশ্রুতিমুখর বাজেট রাজ্যবাসীকে উপহার দিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পরে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার যে দিকটি নিয়ে সবচেয়ে বেশী সরব ছিলেন সেটি হল ৬৪ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকারের নেওয়া ২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ঋণ কমানোর কোনও লক্ষণ নেই উপরন্তু সেই ঋণ বাড়তে বাড়তে এখন চার লক্ষ চৌষট্টি হাজার কোটি টাকায় পৌছেছে। বাংলার প্রতিটি মানুষ পিছু প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার দেনা। এ দেনা আমার আপনার প্রতিটি মানুষের কাঁধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বোঝা। প্রতি বছর শুধু সুদ মেটাতেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি বেরিয়ে যায়। এ বছরও নতুন করে আশি হাজার কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সদ্য পেশ হওয়া বাজেট বক্তৃতায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতায় আসার পর দাবী করেছিলেন, তিনিই আসল বামপন্থী। রাজ্যের অর্থনীতির হাল দেখলে সেটাই প্রমাণিত হয়। ঋণ নিয়ে ঘি খাওয়ার ব্যাপারে বামপন্থীদের বিশেষ সুনাম আছে। গ্রীস থেকে ভেনেজুয়েলা সর্বত্র একই অবস্থা। রাজ্যের অর্থনীতির এই পরিস্থিতি যেখানে, সেখানে ব্যয় সঙ্কোচের কোনও চেষ্টা আমরা দেখতে পাই না। সারা বছর ধরে মেলা, খেলা আর উৎসবের ছড়াছড়ি। সন্ধ্যেবেলায় রাস্তায় আলো জ্বলবে সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যেভাবে রাস্তাগুলিকে, উড়ালপুল গুলিকে এলইডি লাইটে মুড়ে দেওয়া হয়েছে সাজানোর নামে সেগুলি রুচিসম্মত তো নয়ই বরং কুরুচিপূর্ণ বলেই মনে হয়। যে উড়ালপুল সুন্দর নয়নাভিরাম আলোকে সজ্জিত, দেখা যাচ্ছে তার নীচেই, সহায় সম্বলহীন পরিবার রাত কাটাচ্ছে। সৌন্দর্য্য আসে ভেতরের স্বাস্থ্য থেকে। ডাক্তাররা বলেন, শসাটা, মুখে মাখার চেয়ে পেটে যান, সৌন্দর্য্য বাড়বে, ত্বকে জলীয় পদার্থের যোগান ভেতর থেকে আসবে। আমাদের রাজ্যে বিশেষত কলকাতাকে লন্ডন করার নামে যে বাইরের চাকচিক্য বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে, সেটাও অভুক্ত মানুষের ক্রিম মাখা মুখের মতো। খিদেটা, অপুষ্টিটা বাইরে থেকে লুকোনো যাচ্ছে না।

শিক্ষাতেও একই অবস্থা। বাজেটে নতুন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। তাতে তো জমিও হয় না। মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪২টি। কিন্তু সেগুলির অবস্থা কি? হাজার হাজার শিক্ষকের পদ খালি, বেতনের টাকার অভাবে নিয়োগ হচ্ছে না। রাজ্যের ছেলে মেয়েরা বেশী টাকা দিয়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে কারণ সরকারী পাঁচ ছয়টি বাদে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েরই পরিকাঠামো দেশীয় মানের নয়। স্কুল ও উচ্চশিক্ষা মিলিয় এই অর্থবর্ষের বাজেটে মাত্র ৯৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২৯১০-২০২০ অর্থবর্ষে ছিল ৩১৫০৪ কোটি টাকা। এমনকি তথাকথিত পিছিয়ে পড়া রাজ্য যেমন উত্তরপ্রদেশ বা বিহারেও জনপিছু এর তিনগুণ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। উচ্চশিক্ষায় মাত্র সাতশো (৭০০) কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যেখানে মাদ্রাসাশিক্ষা খাতে এর চারগুণ পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যবাসীর প্রশ্ন আমরা সামনের দিকে এগোতে চাইছি নাকি পেছনের দিকে?

ক্লাবগুলিকে দুলক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয় খেলাধুলোয় উন্নতির জন্য। গত নয় বছরে এ রাজ্য থেকে ক্রীড়ায় সাফল্য কিন্তু আমাদের চোখে পড়েনি। সরকারী টাকা ক্লাবগুলিকে বিলানো কি রেডিমেড ক্যাডারবেস পাওয়ার জন্য? আমরা প্রত্যেকেই ট্যাক্স দিই, ইনকাম ট্যাক্স সবাই না দিলেও, আমরা যে পণ্য অথবা পরিষেবা ক্রয় করি তাতে ট্যাক্স থাকে। আমাদের ট্যাক্সের টাকা এভাবে বিলিয়ে পার্টিকর্মী বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হলে আমরা চুপ থাকি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতায় আসার পর দাবী করেছিলেন, তিনিই আসল বামপন্থী। রাজ্যের অর্থনীতির হাল দেখলে সেটাই প্রমাণিত হয়। ঋণ নিয়ে ঘি খাওয়ার ব্যাপারে বামপন্থীদের বিশেষ সুনাম আছে। গ্রীস থেকে ভেনেজুয়েলা সর্বত্র একই অবস্থা। রাজ্যের অর্থনীতির এই পরিস্থিতি যেখানে, সেখানে ব্যয় সঙ্কোচের কোনও চেষ্টা আমরা দেখতে পাই না। সারা বছর ধরে মেলা, খেলা আর উৎসবের ছড়াছড়ি। সন্ধ্যেবেলায় রাস্তায় আলো জ্বলবে সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যেভাবে রাস্তাগুলিকে, উড়ালপুল গুলিকে এলইডি লাইটে মুড়ে দেওয়া হয়েছে সাজানোর নামে সেগুলি রুচিসম্মত তো নয়ই বরং কুরুচিপূর্ণ বলেই মনে হয়। যে উড়ালপুল সুন্দর নয়নাভিরাম আলোকে সজ্জিত, দেখা যাচ্ছে তার নীচেই, সহায় সম্বলহীন পরিবার রাত কাটাচ্ছে। সৌন্দর্য্য আসে ভেতরের স্বাস্থ্য থেকে। ডাক্তাররা বলেন, শসাটা, মুখে মাখার চেয়ে পেটে যান, সৌন্দর্য্য বাড়বে, ত্বকে জলীয় পদার্থের যোগান ভেতর থেকে আসবে। আমাদের রাজ্যে বিশেষত কলকাতাকে লন্ডন করার নামে যে বাইরের চাকচিক্য বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে, সেটাও অভুক্ত মানুষের ক্রিম মাখা মুখের মতো। খিদেটা, অপুষ্টিটা বাইরে থেকে লুকোনো যাচ্ছে না।

কি করে? অর্থমন্ত্রী যে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের কথা বলেছেন সেগুলি কে ক্লাবের সাথে জড়িত বেকার যুবকদের ধরে বলেছেন? রাজ্যে শিল্পসংস্থান হলে যে কাজ জুটত সেটাকে কিছু বেকার যুবককে এভামে কলাটা মুলোটা পাইয়ে দিয়ে ভুলিয়ে রাখা কতদিন সম্ভব?

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। গত অর্থবর্ষে বরাদ্দ ছিল ৯৫৫৬ কোটি টাকা, এ বছর সেটা দাড়িয়েছে ৪৬০৮ কোটি টাকায়। যেখানে জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বরাদ্দ বাড়ানো উচিৎ, সেখানে বরাদ্দ অর্ধেক করা হয়েছে। এরপর আমরা আশা করব, এ রাজ্যে স্বাস্থ্যে বেসরকারীকরণ বন্ধ হবে, মানুষ চেন্নাই, ভেলোর যাওয়া বন্ধ করবে। সিপিএম এর আমলে স্বাস্থ্যের বেসরকারীকরণ শুরু হয়েছিল প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপে (আমরি), সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থা কে ইচ্ছাকৃত ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল যাতে বেসরকারী হাসপাতাল গুলি ফুলেফেঁপে ওঠে। এই সরকারের আমলে সেটা একধাপ এগিয়েছে। এখন ছোট ব্যবসায়ী, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষেরাও সামান্য কিছু অসুখ হলে প্রাইভেট হাসপাতালে যান। রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের বিমাও সাধারণ মানুষ যাতে না পান সেই ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার।

পার্টনারশিপ্পে সরকারী জমিতে বিশাল বিশাল আবাসন তৈরি হল। তাতে শুধুমাত্র কিছু লোক মুনাফা করল প্রচুর পরিমাণে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে কলকাতার পাশে সিঙ্গুরের তিন ফসলা জমিতে কারখানা করতে হত না, বাঁকুড়া পুরুলিয়াতেও পরিকাঠামো গড়ে তোলা যেত শিল্পের উপযোগী করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বিরোধী থাকাকালীন শিল্প নেই কেন বলে তুলোধনা করছিলেন, তিনি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন। ক্ষমতায় আসার পর শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ তো দূরের কথা ইনি বিদ্যুতের খুঁটি পোতার জন্যও জমি নেবেন না পণ করলেন। এমনকি নিজেকে বামপন্থী বলে প্রমাণ করার জন্য এসইজেড এর প্রবল বিরোধীতা করে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশেও বাধা দিলেন।

রাজ্যের শিল্পের অবস্থা কিরকম সেটার জন্য আপনাকে অর্থনীতি বুঝতে হবে না। টিভি খুলবেন, পেপারে চোখ রাখবেন, রাস্তায় যেতে যেতে হোর্ডিং গুলির (যার একটা বড় অংশ আজকাল খালি থাকে) দিকে তাকাবেন। যে সমস্ত মিডিয়াম বাংলা কেন্দ্রিক সেখানে বিজ্ঞাপন দেখবেন হয় বেসরকারী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত না হয় বেসরকারী শিক্ষা সংক্রান্ত। এই দুটি শিল্পের রমারমা এখানে। আর কিছু নেই। এই দুটি শিল্পের রমরমা আবার আখেরে ক্ষতি করে।

রাজ্য সরকার দাবী করেছে, গত নয় বছরে বাইশ হাজার কোটি টাকার শিল্প

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী শিল্প নিয়ে সক্রিয় ছিলেন না। শিল্পের জন্য তিনটি জরুরী শর্ত হল জল, জমি এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা। জ্যোতি বসুর রাজত্বকালে নতুন শিল্প তো দূরের কথা, পুরোনো কারখানা গুলিও সব জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নবাজির ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাইশ বার লন্ডন গিয়েছিলেন শিল্প আনতে, শেষমেষ শিল্প হিসাবে দেখা গেল শুধুমাত্র আবাসন শিল্প। নিজেদের কাছে লোকেদের কাছের লোকেদের সাথে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ্পে সরকারী জমিতে বিশাল বিশাল আবাসন তৈরি হল। তাতে শুধুমাত্র কিছু লোক মুনাফা করল প্রচুর পরিমাণে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে কলকাতার পাশে সিঙ্গুরের তিন ফসলা জমিতে কারখানা করতে হত না, বাঁকুড়া পুরুলিয়াতেও পরিকাঠামো গড়ে তোলা যেত শিল্পের উপযোগী করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বিরোধী থাকাকালীন শিল্প নেই কেন বলে তুলোধনা করছিলেন, তিনি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন। ক্ষমতায় আসার পর শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ তো দূরের কথা ইনি বিদ্যুতের খুঁটি পোতার জন্যও জমি নেবেন না পণ করলেন। এমনকি নিজেকে বামপন্থী বলে প্রমাণ করার জন্য এসইজেড এর প্রবল বিরোধীতা করে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশেও বাধা দিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য রাজ্যে যেখানে সপ্তম পে কমিশন চালু হয়ে গেছে। সেখানে এখানে এখনও ষষ্ঠ পে কমিশন পুরোপুরি চালু করা যায়নি। বাজেটের রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের ডিএ বাড়ানোর কোনও উল্লেখ নেই। এটা মাথায় রাখতে হবে, জনগণের হাতে টাকা না এলে, চাহিদা বাড়বে না, চাহিদা না বাড়লে কর্মসংস্থান হবে না, রাজস্ব আদায় হবে না। কৃষি, শ্রমিক উন্নয়নেও বরাদ্দ কমানো হয়েছে। পার্বত্য উন্নয়ন, সংশোধনাগার উন্নয়ন, বনসম্পদ উন্নয়ন, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এবার বরাদ্দ কমানো হয়েছে। কারণ, সুদ পরিশোধেই বেশীরভাগ টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠবে, অর্থনীতির এই হাল কেন? কিছু ক্ষেত্রে ব্যয়সঙ্কোচ করে হয়তো কিছুটা ঋণের পরিমাণ কমানো যাবে। কিন্তু আসল সমস্যার কারণ ও সমাধান অন্য।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী শিল্প নিয়ে সক্রিয় ছিলেন না। শিল্পের জন্য তিনটি জরুরী শর্ত হল জল, জমি এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা। জ্যোতি বসুর রাজত্বকালে নতুন শিল্প তো দূরের কথা, পুরোনো কারখানা গুলিও সব জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নবাজির ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাইশ বার লন্ডন গিয়েছিলেন শিল্প আনতে, শেষমেষ শিল্প হিসাবে দেখা গেল শুধুমাত্র আবাসন শিল্প। নিজেদের কাছে লোকেদের কাছের লোকেদের সাথে পাবলিক প্রাইভেট

বিনিয়োগ হয়েছে এ রাজ্যে। এই সময়ে গুজরাত এবং অন্যান্য শিল্পোন্নত রাজ্যে কোথাও আটগুণ, কোথাও দশ গুণ বেশী বনিয়োগ এসেছে। এমনকী উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য যেখানে আইন শৃঙ্খলা প্রশ্নের মুখে ছিল কয়েক বছর আগেও, সেখানে এখন এ রাজ্যের চরম শিল্প বিনিয়োগ বেশী আসছে। সিন্ডিকেট অন্যতম বড় কারণ এরাজ্যে থেকে অন্য রাজ্যে শিল্প চলে যাওয়ার পেছনে। এটা ঠিক সিন্ডিকেট তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগেও ছিল এখানে। কিন্তু রাজনৈতিক সদিচ্ছা বড়ই জরুরী, সিন্ডিকেট এর বাধা কে অতিক্রম করে শিল্পদ্যোগীদের ধরে রাখতে বা উৎসাহিত করতে। সরকার চাইলে একটা দুটো এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে, সিন্ডিকেট কে দমিয়ে রেখে কারখানা স্থাপনে সাহায্য করতে পারে। সেখানে হয়তো সাময়িক ভাবে সিন্ডিকেটের বেকার যুবকেরা অখুশী হবে, কিন্তু যখন দেখবে এর ফলে তারা কাজ পাচ্ছে তখন ধীরে ধীরে এগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যান্য এলাকাতেও মানুষ বুঝতে পারবে যে সিন্ডিকেট করে শিল্প কে বাধা দিলে আখেরে ক্ষতি।

সামগ্রিক ভাবে শিল্পস্থাপন ও কর্মসংস্থান ই এ রাজ্যের বেহাল অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করাতে পারে। শিল্প এলে সরকারের রাজস্ব বাড়বে। কর্মসংস্থান হলে ভোগ্যপণের চাহিদা বাড়বে, যেটা আবার সরকারকে রাজস্ব বাড়াতে সাহায্য করবে।

ঋণের ফাঁদে পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জির সরকার ২০১১ সালে 'পরিবর্তন'-এর আওয়াজ তুলে ক্ষমতায় এসেছিলেন। গত নয়-বছরে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের বাজেট বক্তৃতায় শ্রীমতী ব্যানারজির গুণকীর্তন করা ছাড়া সব ব্যাপারেই পরিবর্তন এসেছে। এর মধ্যে সবথেকে বড় পরিবর্তনটা হল, বাজেট বক্তৃতায় এখন আর রাজ্যের দেনা নিয়ে তেমন উল্লেখ থাকে না। কারন 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়' ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সালের মধ্যে রাজ্যের মোট ঋণের বোঝা দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে।

রাজ্যের দেনা ৯ বছরে দ্বিগুণ

২০১২-১৩ সালে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে গিয়ে অমিত মিত্র তাঁর বক্তৃতার পুরো একটি পরিচ্ছদ পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দেনার ওপর ব্যায় করেছিলেন এবং পূর্ববর্তী (বামফ্রন্ট) সরকারকে ৩৪ বছরের শাসন শেষে, 'প্রায় ২,০০,০০০ কোটি টাকার দেনা' রেখে যাবার দায়ে তুলোধোনা করেছিলেন। তাঁর নিজের কথায়, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি শিশু মাথায় ২১,০০০ টাকার দেনা নিয়ে জন্ম নিচ্ছে।' শ্রীমিত্র ২০১২ সালের বাজেট বক্তৃতায় আরও বলেন যে—পশ্চিমবঙ্গ ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী সরকারের রেখে যাওয়া দেনার কারণে '২০১১-১২ সালে পশ্চিমবঙ্গকে বছরে ২২,০০০ কোটি টাকা শোধ করতে হয়েছে।'

২০২০-২১ সালের বাজেট বক্তৃতায়, রাজ্যের ঋণ নিয়ে বরাদ্দ ছিল একটি লাইন সেটাও কেন্দ্রের সমালোচনায় ব্যায় হয়েছে। কারণ, ২০১৯-২০ সালের সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী সরকারের সর্বমোট দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৪,৩১,৭৮৬.১২ কোটি টাকা। অর্থাৎ, ২০১১ সালের দ্বিগুণের বেশি। বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী, আগামী অর্থবর্ষে (২০২০-২১) সমগ্র ঋণের পরিমাণ বেড়ে ৪,৭৪,৮৩১ কোটিতে দাঁড়াবে। অর্থাৎ, তৃণমূল সরকারের দশ বছরে, ঋণ বাড়বে প্রায় আড়াই গুণ।

রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু দেনা ডবল

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ৯.১৩ কোটি। সে হিসেবে প্রতিটি বাঙালির মাথায় এখন ৪৭,০০০ টাকার বেশি দেনা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা মাথায় রাখলে মাথাপিছু দেনার পরিমাণ ৪৫,০০০ টাকা। অর্থাৎ, বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে যতটা দেনায় ডুবিয়েছিল, তৃণমূল তার থেকে বেশি ডুবিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংকের ২০১৯ সালের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্য ৫৪ শতাংশ দেনা করেছে ৫ থেকে ১০ বছরের মেয়াদে। অর্থাৎ, এই দেনার দায় রাজ্যের সাধারণ মানুষকে অনেকদিন ধরে ভোগ করতে হবে। রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাম থেকে তৃণমূল, রাজ্যের আর্থিক হালে কোনও উন্নতি হয়নি। ত্রয়োদশ ফিনান্স কমিশন প্রস্তাব করেছে ঋণকে রাজ্যের সামগ্রিক উৎপাদনের (GSDP) ২৫ শতাংশ বেঁধে দেওয়ার। পশ্চিমবঙ্গের ঋণ এখন ৩০ শতাংশের অনেক বেশি।

তৃণমূল সরকার অবশ্য 'কেন্দ্রের বঞ্চনার' কথা বলে দৃষ্টি ঘোরাবার চেষ্টা করছেন, যেমন করেন। কিন্তু বাস্তব হল, আইন অনুযায়ী সব রাজ্যকেই তার ঋণের দায়িত্ব নিতে হয়। রাজ্যেক্ষমতার আসার সময়ে তৃণমূল কেন্দ্রের তদানীন্তন ইউপিএ সরকারেও ছিল। রাজ্য সে সময়ে ঋণ-পরিশোধকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার জন্যে কেন্দ্রের কাছে দরবার করে। (২০১২ সালের বাজেট বক্তৃতায় তার উল্লেখ আছে।) কিন্তু, কেন্দ্র তাতে সায় দেয়নি। কারণ, সেটা আইনানুগ না। রাজ্যের উচিত ছিল খরচ কমিয়ে অর্থনীতিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। সেটা হয়নি।

কেন্দ্রীয় করের টাকায় খয়রাতি

লাগামছাড়া খরচ, কেন্দ্রের সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া, ও ভোটের উদ্দেশ্যে খয়রাতি করতে যাবার ফল হিসেবে ২০১৯-২০ সালে সরকার বাজার থেকে আনুমানিক ৫৩,০০০ কোটি টাকার নতুন দেনা করেছেন যা ২০১৮-১৯

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থার কথা বললেই মমতা ব্যানার্জি ও তার অর্থমন্ত্রী দেশ, বিজেপি শাসিত রাজ্যের কথা বলে দৃষ্টি ঘোরাবার চেষ্টা করেন। বাস্তব কিন্তু অন্যরকম। বিশ্বের নাম করা অর্থনৈতিক সংবাদসংস্থা 'ব্লুমবারগ' অক্টোবর ১, ২০১৯ তারিখেব প্রতিবেদনে জানাচ্ছে— ভারতের রাজ্যগুলির ভেতর আর্থিক অবস্থার নিরিখে সবথেকে খারাপ অবস্থা কংগ্রেস শাসিত পাঞ্জাবের; তারপরে উত্তরপ্রদেশ (যেখানে বিজেপি ২০১৭ সালে ক্ষমতায় এসেছে) এবং পশ্চিমবঙ্গ। অবস্থা ভালো এমন রাজ্যগুলিহল— মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও কর্নাটক, তেলঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গের পড়শি অসম, যেখানে বিজেপি ২০১৬ সালে ক্ষমতায় এসেছে। শুধু ব্লুমবারগ না। প্রবল বিজেপি-বিরোধী পত্রিকা 'দি ওয়্যার' (The Wire), ২০১৯ সালের ২৫ জুনের একটি প্রতিবেদনে রাজ্যের বৃদ্ধির হার নিয়ে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রর বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। প্রতিটি বাজেটেই তৃণমূল সরকার দাবি করে আর্থিক বৃদ্ধির হারে পশ্চিমবঙ্গ বাকি দেশের থেকে এগিয়ে। বামফ্রন্ট আমলের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তও ঠিক এমনটাই দাবি করতেন। দীর্ঘ অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে 'দি ওয়্যার' দেখিয়েছে, রাজ্যের আসল বৃদ্ধির হার অনেক কম।

সালের তুলনায় ২৬ শতাংশ বেশি। একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক ঋণশোধের পরিমাণ ৪৯,০০০ কোটি টাকা (২০১৮-১৯) থেকে ১৪ শতাংশ বেড়ে আনুমানিক ৫৬,০০০ কোটি টাকা (২০১৯-২০) হয়েছে। ২০১১ সালে ঋণপরিশোধে ব্যায় ছিল ১৯,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, তৃণমূল সরকারের আমলে ঋণ পরিশোধে বাৎসরিক খরচ তিনগুণ বেড়েছে।

লক্ষ্যণীয়, সরকার এখন বাজার থেকে বছরে যে দেনা করে, তার প্রায় সমপরিমাণ টাকার ঋণ শোধ করে। অর্থাৎ, ঋণ কবে উন্নয়নের কাজ করা হচ্ছে এটা বলা যাচ্ছে না।সরকার বলছেন আয় বাড়িয়ে ব্যায়করছেন, কিন্তু কোন আয়? ভারতের সব রাজ্যই তার বাড়তি খরচের জন্যে কেন্দ্রের আওতায় থাকা করের বাইরে নিজস্বকর আদায় করে। যেমন- পেট্রোল-ডিজেলের ওপর ট্যাক্স, স্ট্যাম্প ডিউটি, আবগারি শুল্কইত্যাদি।

রিজার্ভ ব্যাংক ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ অবধি দেশের রাজ্যগুলির সামগ্রিক উৎপাদনের অনুপাতে নিজস্ব কর আদায়ের একটা তালিকা করেছেন। ২৯ টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৯ তম। শিল্পোন্নত রাজ্যগুলির কথা বাদ দিলেও পড়শি বিহার ও ওড়িশাও পশ্চিমবঙ্গের ওপরে আছে। পশ্চিমবঙ্গের নীচে আছে ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখন্ড এবং সিকিম সহ উত্তরপূর্বের আটটি রাজ্য, যারাপ্রায় সবাই পেছিয়ে থাকা রাজ্য, দুর্গম এলাকায় অবস্থিত এবং (পশ্চিমবঙ্গের থেকে) আয়তন ও জনসংখ্যায় অনেক ছোট।

আয় যদি কম হয়, তাহলে ব্যায় কেমন? রাজ্যের বাজেট প্রস্তাবের সঙ্গে পেশ করা 'রাজস্ব নীতি বিবৃতি'তে (Mid-term fiscal policy Statement & Fiscal Policy Strategy Statement for ২০২০-২১) দেখা যাচ্ছেপশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজের রোজগার থেকে খরচের পরিমাণ (own tax receipts as per centum of revenue expenditure) কমছে। অর্থাৎ, খরচ যা বাড়ছে সেটা কেন্দ্রীয় করের টাকা আর ঋণের ওপর নির্ভর করে।

অসত্য দাবি

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থার কথা বললেই মমতা ব্যানার্জি ও তার অর্থমন্ত্রী দেশ, বিজেপি শাসিত রাজ্যের কথা বলে দৃষ্টি ঘোরাবার চেষ্টা করেন। বাস্তব কিন্তু অন্যরকম। বিশ্বের নাম করা অর্থনৈতিক সংবাদসংস্থা 'ব্লুমবারগ' অক্টোবর ১, ২০১৯ তারিখেব. প্রতিবেদনে জানাচ্ছে— ভারতের রাজ্যগুলির ভেতর আর্থিক অবস্থার নিরিখে সবথেকে খারাপ অবস্থা কংগ্রেস শাসিত পাঞ্জাবের; তারপরে উত্তরপ্রদেশ (যেখানে বিজেপি ২০১৭ সালে ক্ষমতায় এসেছে) এবং পশ্চিমবঙ্গ। অবস্থা ভালো এমন রাজ্যগুলিহল— মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও কর্নাটক, তেলঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গের পড়শি অসম, যেখানে বিজেপি ২০১৬ সালে ক্ষমতায় এসেছে।

শুধু ব্লুমবারগ না। প্রবল বিজেপি-বিরোধী পত্রিকা 'দি ওয়্যার' (The Wire), ২০১৯ সালের ২৫ জুনের একটি প্রতিবেদনে রাজ্যের বৃদ্ধির হার নিয়ে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রর বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। প্রতিটি বাজেটেই তৃণমূল সরকার দাবি করে আর্থিক বৃদ্ধির হারে পশ্চিমবঙ্গ বাকি দেশের থেকে এগিয়ে। বামফ্রন্ট আমলের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তও ঠিক এমনটাই দাবি করতেন। দীর্ঘ অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে 'দি ওয়্যার' দেখিয়েছে, রাজ্যের আসল বৃদ্ধির হার অনেক কম।

উন্নয়ন বাদ দিয়ে নাম কেনার ফিকির

প্রশ্ন উঠতে পারে, আর্থিক অবস্থা ভালো, না খারাপ জেনে কী হবে? লোকে তো পাচ্ছে। মেলা, ক্লাবের টাকা সবই তো হচ্ছে। কথাটা ঠিক, আবার ঠিক না। খরচা করা হচ্ছে এমন জায়গায় যাতে লোকে হাততালি দেয়। আর সেটা সামাল দিতে কৃষি, বিদ্যুৎ, শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে খরচা বাজেট বরাদ্দের থেকে কম করা হচ্ছে। বছরের শুরুতে গাদাগাদা টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়, যাতে কাগজ-টিভিতে প্রচার হয়, লোকে ভাবে অনেক উন্নতি হচ্ছে। আসলে খরচা করা হয় তার থেকে অনেক কম। কিন্তু, সে হিসেব পেতে পেতে বছর গড়িয়ে যায়।

কৃষিক্ষেত্রে সরকার ২০১৮-১৯ সালে খরচা করেছিল ৮,৫৩৯ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ সালের জন্যে

৯,৭৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। এবারের বাজেটে দেখা যাচ্ছে, ২০১৯-২০ সালে আনুমানিক খরচ হবে ৬,৪১৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ,আসল খরচ ২০১৮-১৯ সালের থেকে ৩৩ শতাংশ কম। একই অবস্থা অন্যান্য নানাক্ষেত্রে। সেচ ও বন্যাপ্রতিরোধে ২০১৯-২০ সালের যা বাজেট বরাদ্দ ছিল, আসল খরচ তার থেকে ৩০ শতাংশ কম করা হয়েছে। খরচা কমানো হচ্ছে বিদ্যুৎক্ষেত্রে। শিল্প ও খনিজসম্পদের পেছনে ২০১৮-১৯ সালে খরচা হয়েছে ১৮০৮ কোটি টাকা; ২০১৯-২০ সালে বরাদ্দ ছিল ২,২৯৬ কোটি টাকা; আসলে খরচা করা হয়েছে ১,৪১৯ কোটি টাকা, যা কি না বিগত বছরের থেকে ২১ শতাংশ কম। জলসরবরাহ, হাউজিং, শহর উন্নয়ন খাতে ২০১৯-২০ সালে বাজেট বরাদ্দের থেকে হাজার কোটি টাকা (৭ শতাংশ) কম খরচা করা হয়েছে। শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির পেছনে আসল খরচ বাজেটের থেকে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা কম।

তাহলে কী দাঁড়াল? ঋণবাড়ল, সামগ্রিক খরচা বাড়ল, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে খরচা কমল। এই ভাবেই চলবে যতদিন না পুরোব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ে। তাছাড়া কেন্দ্রের বঞ্চনার গান তো আছেই।

ঋণ কমিয়ে উন্নয়ন সম্ভব ছিল

প্রশ্ন হল, ঋণ কমিয়ে ওকি এর থেকে বেশি উন্নয়ন করা যেত? উত্তর হল অবশ্যই যেত। কিন্তু তাতে লোকে সত্যিগুলো জেনে যেত, হাততালি কম পড়ত। আগেই বলা হয়েছে যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ নিজের রোজগার বাড়াতে পারেনি। ফলে উন্নয়ন কেন্দ্রের টাকার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু রাজ্য সেটা লোককে জানতে দিতে চায় না। মোদি সরকার সামাজিক উন্নয়নে একরাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছেন। সব রাজ্যই এতে উপকৃত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে এসব প্রকল্পের নাম বদলে দেওয়া হয় যাতে লোকে মমতা ব্যানার্জির নামে হাততালি দেয়। 'প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনা'র নাম বদলে হয়েছে 'বাংলার গ্রামীণ সড়ক যোজনা'। 'স্বচ্ছভারত' হয়েছে 'নির্মলবাংলা'। এরকম আরও বহু উদাহরণ আছে। এসব প্রকল্পের সিংহভাগ টাকাই আসে কেন্দ্র থেকে, অথচ নাম কিনছেন মমতা ব্যানার্জি।

আয়ুষ্মান ভারত রূপায়ণে বাধা

যেখানে নাম বদলানো সম্ভব হয়নি, অথবা মমতা ভয় পেয়েছেন যে লোকে জেনে যাবে যে মোদীসরকার উন্নয়ন করছে, সেখানে কেন্দ্রের প্রকল্প বাতিল করে দিয়েছেন, তাতে রাজ্যের ক্ষতি হয় হোক। গরিব মানুষ যাতে বেসরকারি হাসপাতালে সামান্য খরচে চিকিৎসা পায়, সেজন্যে কেন্দ্র 'আয়ুষ্মানভারত' প্রকল্প এনেছেন। পড়শি রাজ্য আসাম, ঝাড়খণ্ডে মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেন। আসামের সবথেকে বড় ক্যানসার হাসপাতালে এখন প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসা করাচ্ছেন। এছাড়াও আছে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমাযোজনা। ২০১৮ সালে আনা পিএম-কিষান প্রকল্পে চাষিদের ব্যাঙ্কে সরাসরি টাকা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলসরকার এই তিনটি প্রকল্পই পশ্চিমবঙ্গে রূপায়িত হতে দেয়নি। তার বদলে রাজ্যের ধার করা টাকায় চালু হয়েছে স্বাস্থ্যসাথী, শস্যসাথী ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যকে বেশি হলে ৪০ শতাংশ খরচ দিতে হত। অর্থাৎ, রাজ্যের কোষাগারে চাপ কম পড়ত,শিল্পের মতো গুরত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে খরচা কমাতে হত না। এখন চাপ রাজ্যের ঘাড়ে এদিকে স্বাস্থ্যসাথী বা শস্যসাথী দুটোতেই আসামের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কম সুবিধে পায়।

খাদ্যসামগ্রীর কালোবাজারিতে ক্ষতি

এখানেই অবশ্য শেষ না। কেন্দ্রের খাদ্যসুরক্ষা আইনে পশ্চিমবঙ্গের ৬০ শতাংশ মানুষ দুটাকা দরে চাল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী পায়। মমতাসরকার নাম কিনতে গিয়ে, বাড়তি খরচ করে প্রায় ১০০ শতাংশ মানুষকে এর আওতায় এনেছেন। ফলদুটো ১) কোষাগারে চাপ বেড়েছে। ২) যাদের দরকার নেই তাদের নামে ও সস্তায় খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হচ্ছে, যা নিয়ে কালোবাজারি হচ্ছে। সরকারি অফিসারেরা মনে করেন এই কালোবাজারির পরিমাণ প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা। সরকারের টাকা ভূতে খাচ্ছে।

সব মিলিয়ে প্রাথমিক হিসেব থেকে মনে করা হয় সব কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সঠিক রূপায়ণ হলে রাজ্যের

৪,০০০ থেকে ৫০০০ কোটি টাকা বাঁচত। এই বাড়তি খরচের ফল আগামীতে নানাভাবে রাজ্যের মানুষের ঘাড়েই পড়বে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা বেতন বাড়াবার কথা বললেই শুনতেহবে 'ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচানি' বন্ধ করুন।

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

9-Ashok Road
New Delhi-110001
Phone011-23005850
E-mail : office@spmrf.org